## ২. ডিরেকটরির শাসন ঃ সামরিক নেতা হিসাবে নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান (১৭৯৫-১৭৯৯)

নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থানের ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে, অর্থাৎ, ডিরেকটরির শাসনকালে (১৭৯৫-৯৯) তিনি একজন অত্যন্ত দক্ষ সমরনায়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৭৯৩ সালে ইংরেজরা যখন তুঁল বন্দর অবরোধ করেছিল, তখন নেপোলিয়ান তাদের হাত থেকে তুঁল উদ্ধার করে একজন দক্ষ সামরিক নেতা হিসাবে প্রথম সবার নজরে পড়েন। সেই শুরু। শেষ ওয়াটারলুর যুদ্ধে। ডিরেকটরির শাসনকালেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন তিনি পৃথিবীর সেরা বীরদের একজন। এরপর ১৭৯৯ থেকে ১৮০৪ সালের মধ্যে অর্থাৎ কনসালেটের সময়ে তিনি একের এক নানা সংস্কার জারী করে ফ্রান্সের মানুষের মন জয় করে প্রমাণ করলেন তিনি শুধু শ্রেষ্ঠ সেনানায়কই নন, প্রশাসক হিসাবেও তিনি অদ্বিতীয়। ১৮০৪ সালে তিনি নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। নেপোলিয়ান কিন্তু এখানেই থেমে রইলেন না। তাঁর স্বপ্ন ছিল ইউরোপের অধীশ্বর হওয়া। ১৮০৪ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে নেপোলিয়ান ইউরোপের একটি বড় অংশের উপর তাঁর একাধিপত্য স্থাপন করেন। ১৮০৭ সালে তিনি রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্দারের সঙ্গে টিলজিটের (Tilsit) সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই সময় তিনি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার পরেই তাঁর পতন শুরু হয়। আগেই বলেছি যে, ফরাসী বিপ্লবের অন্তিমলগ্নে যে নৈরাশ্য ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল, তা নেপোলিয়ানের উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এই সুযোগের তিনি পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। ক্ষমতার লোভ তাঁর অবশ্যই ছিল ও ইচ্ছাশক্তিও ছিল। তবে প্রথম দিকে জড়তাও ছিল। উদ্বেগ ও ইতস্ততঃ মনোভাব কিছুটা ক্ষতি করেছিল। কিন্তু একের পর এক সাফল্য তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করেছিল। তিনি নিজের উপর আস্থা খুঁজে পেয়েছিলেন। ঠাণ্ডা মাথায় তিনি তাঁর লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি নামগোত্রহীন। সুতরাং আচমকা ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি কোন ঝুঁকি নিতে চান নি। যখন তিনি বুঝেছিলেন যে, ফ্রান্সের মানুষ তাঁর একনায়কতন্ত্র মেনে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত, তখনই তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে হঠকারিতার কোন স্থান ছিল না। পরের দিকে তিনি এই স্থৈর্য ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। যাই হোক তাঁর উত্থান যে যথেষ্ট চমকপ্রদ ও নাটকীয় ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কনভেনশনের পর ফ্রান্সে ডিরেকটরির শাসন শুরু হয়। ডিরেকটরির শাসনকে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন রোবসপীয়রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী বিপ্লবের অবসান হ'য়েছিল। বিপ্লবের পতাকা বহনকারী সাঁ কুলোৎদের ভূমিকা শেষ হ'য়েছিল। এর পর শুরু হ'য়েছিল প্রতি বিপ্লবের অধ্যায়, যার পরিণতি নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থানে। একদিকে ফরাসী বিপ্লবের ভয়াবহতা ও অন্যদিকে নেপোলিয়ানের ঘটনাবহুল ও রোমাঞ্চকর অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী এই পাঁচ বছরের

Scanned with CamScanner

ইতিহাসকে অনেকেই তাই কিছুটা অবহেলাভরে বর্ণনা করেন। এই পাঁচ বছর না পুরোপুরি বিপ্লবের অঙ্গীভূত, না পুরোপুরি নেপোলিয়ানের জীবনের ইতিহাস। সম্প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের পরিবর্তন হ'য়েছে। সি. চার্চের (C.Church) মতে বৈপ্লবিক ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য গঠিত হ'য়েছিল এই ডিরেক্টরি। সুতরাং ১৭৯৪ নয়, ১৭৯৯ সালেই বিপ্লবের অবসান হ'য়েছিল। অন্যদিকে অনেকেই থার্মিডোরিও ক্ষমতা দখলকে রোবসপীয়রের উগ্রপন্থী বৈপ্লবিক নীতির বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া হিসাবে গণ্য করতে রাজী নন। তালিয়েন (Tallien), বারাস (Barras), ফুশে (Fouche) প্রভৃতি রোবসপীয়রের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা ছিলেন কট্টর বামপন্থী। তাঁদের দৃষ্টিতে রোবসপীয়র ছিলেন নরমপন্থী। এমন কি বেবিফুফের (Babeuf) মত কিছু সমাজতন্ত্রীও কিছুদিনের জন্য থার্মিডোরিওদের সঙ্গে ছিলেন। লিঁওর (Lyons) মতে থার্মিডোরিও প্রতিক্রিয়া ছিল বামপন্থী একটি বিপ্লব। যাই হোক থার্মিডোরিও প্রতিক্রিয়ার পিছনে বামপন্থীদের হাত থাকলেও, এর ফলে দক্ষিণ পন্থীরাই লাভবান হ'য়েছিল। তাছাড়া বিপ্লবের স্রোত পুরোপুরি অবরুদ্ধ না হলেও তা যে গতি হারিয়ে ছিল, সে কথা মানতে হবে। ১৭৯৫ সালে যে সংবিধান চালু হ'য়েছিল, তাকে বৈপ্লবিক বলা চলে না। ডিরেক্টরি ক্রমে একনায়কতন্ত্রের সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছিল ব্যক্তি পূজার মাধ্যমে।

ডিরেক্টরির শাসনের ফলে ফ্রান্সের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা রূপে আবির্ভূত হয় এক নতুন শ্রেণীর মানুষ। এঁরাও অবশ্য বুর্জোয়া শ্রেণীভুক্ত। তবে সব শ্রেণীর বুর্জোয়াদের ঠাঁই হয়নি। এঁদের মধ্যে ছিল যুদ্ধের ঠিকাদার, ফাটকাবাজ, চার্চ ও দেশত্যাগীদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির ক্রেতা প্রভৃতি পয়সাওয়ালা মানুষ। অর্থ উপার্জন ও মুনাফা ছিল এদের প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এরা মাথা ঘামাতো না। এক বছর যাবৎ কিছুটা ইতস্ততঃ করার পর থার্মিডোরিয়ানরা একটি নতুন সংবিধান রচনা করতে সমর্থ হয়। এই সংবিধান তৃতীয় বর্ষের সংবিধান নামে পরিচিত। থার্মিডোরিয়ানরা একদিকে জেকোবিন মতাদর্শ ও অন্যদিকে প্রতিবিপ্লবী প্রবণতা উভয়ের বিরুদ্ধেই সতর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিল। ১৭৯৫ সালের সংবিধান তাই গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র উভয়কেই এড়াতে চেয়েছিল। ফলে অপামর জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হ'লো এবং পরোক্ষ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হলো। সম্পত্তির অধিকারী একমাত্র বিত্তবান মানুষকে কেন ভোটাধিকার দেয়া হলো, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৭৯৫ সালের সংবিধানের মূল প্রণেতা নরমপন্থী নেতা বইসি দ এ্যাংলাস (Boissy d' Anglas) বলেছেন —"We should be governed by the best, and the best are those best educated and most interested in upholding the law .... you will only find such men among those, possessing property, and attached to the country containing it..." এই সংবিধান অবশ্যই পুরাতন অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা যাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, সেদিকে নজর রেখেছিল। অর্থাৎ ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে অর্জিত তৃতীয় সম্প্রদায়ের বিজয়কে তারা ধরে রাখতে চেয়েছিল। অন্যদিকে নতুন যে অধিকারপত্র ঘোষণা করা হলো, তাতে "মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মায় ও স্বাধীন থাকে এবং প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে", এই বিখ্যাত তত্ত্বটি তুলে নেয়া হলো। সাম্য বলতে শুধু এইটুকুই বোঝানো হলো যে, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। তবে প্রত্যেকের যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে, তা স্বীকার করে নেয়া হলো। অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্যের কথাও



স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো। তবে একটু আগেই দেখিয়েছি যে, প্রত্যেকের যৌথভাবে অধিকার বা কর্তব্য স্বীকৃত হয় নি। সন্ত্রাস চলাকালীন জন নিরাপত্তা সমিতির হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের কুফলের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্ষমতা বিভাজন নীতি অনুসরণ করে আইন সভা ও কার্যনির্বাহক ক্ষমতার পৃথকীকরণ করা হলো। এই সংবিধানে দু-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা করা হলো। নিম্ন কক্ষ বা পাঁচ শতের পরিষদের সদস্যদের ন্যূনতম বয়স ছিল ত্রিশ। উচ্চকক্ষকে বলা হতো বয়স্কদের সভা বা Council of Elders। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০ জন এবং সদস্যদের ন্যূনতম বয়স ছিল চল্লিশ। পাঁচ শতের পরিষদের কাজ ছিল আইন প্রস্তাব করা এবং বয়স্কদের সভা যদি তা অনুমোদন করতো, তবে তা আইনে পরিণত হতো। রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল পাঁচ জন পরিচালক বা ডিরেক্টরের হাতে। এঁদের সময় সীমা ছিল পাঁচ বছর এবং এঁরা আইন সভার দ্বারা নির্বাচিত হতেন। পাঁচশতের পরিষদ পঞ্চাশ জনের একটি তালিকা তৈরী করতো এবং তার মধ্য থেকে বয়স্কদের সভা পাঁচ জনকে নির্বাচিত করতো। ডিরেক্টরদের সর্বনিম্ন বয়স সীমা ছিল চল্লিশ বছর। ডিরেক্টরি মন্ত্রীদের নিয়োগ করতো এবং ডিরেক্টরির কাছেই তারা দায়বদ্ধ থাকতো। আইন সভার এক তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি বছর পদত্যাগ করতো এবং তাদের জায়গায় নতুন সদস্য নির্বাচিত হতো। ডিরেক্টরদের মধ্যেও প্রতি বছর একজন পদত্যাগ করতেন এবং নতুন একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হতেন। জনতার ক্ষমতা খর্ব করার জন্য প্যারিসের জন্য একজন মেয়র ও কমিউন-এর পরিবর্তে কয়েকটি পৌরসভা গঠন করা হয়। সরকার ও আইন সভাকে রক্ষা করার জন্য সামরিক রক্ষা বাহিনীর উপর দায়িত্ব দেয়া হয়। তাছাড়া এক বছরের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্থগিত রাখা ও বাড়ী বাড়ী তল্লাস করার অধিকার সরকারকে দেওয়া হয়। সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে চক্রান্তের অভিযোগে গ্রেপ্তার করতে পারতো। এর জন্য আইনের পথ অনুসরণ করারও দরকার ছিল না। যাজক ও দেশত্যাগীদের বিরুদ্ধে আইন বলবৎ করা হয়।

১৭৯৫ সালের সংবিধানের অসংখ্য ত্রুটি ছিল এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল। ডিরেক্টরির শাসন ছিল বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র। এতে অভিজাততন্ত্র এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নি। এমন কি বুর্জোয়াদের একটি অংশকেও অগ্রাহ্য করা হ'য়েছিল। বুর্জোয়াদের যে অংশ বিপ্লবের ফলে উপকৃত হ'য়েছিল ডিরেক্টরিতে একমাত্র তাদের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। বুর্জোয়াদের মধ্যে যাঁরা মার্জিত এবং সুসংস্কৃত তাদের কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। নতুন শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা। কিন্তু তারা ছিল সংখ্যালঘু। সুতরাং ডিরেক্টরির সামাজিক ভিত্তি ছিল খুব দুর্বল। ডিরেক্টরির শাসকগোষ্ঠী রোবসপীয়রের মত উগ্র জেকোবিন একনায়কতান্ত্রিক শাসন থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করার জন্য প্রয়াস পেয়েছিল। নতুন সংবিধান রচনার সময় তারা তা মাথাতে রেখেছিল। তাদের উদ্দেশ্য সফল হ'য়েছিল। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করেছিল। বস্তুতঃ ডিরেক্টরির শাসনকালে রাজনৈতিক নিশ্চয়তা ও স্থিরতা ছিল না। এর দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ হলো সংবিধানের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা। বাৎসরিক নির্বাচন প্রথা— আইনসভার এক তৃতীয়াংশের নির্বাচন ও একজন ডিরেক্টরের নিয়োগ— রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছিল। তাছাড়া ক্ষমতা বিভাজন নীতি কঠোরভাবে প্রয়োগের ফলে আইনসভা ও ডিরেক্টরির মধ্যে সুষ্ঠু বোঝাপড়ার কোন অবকাশ ছিল না। উভয়ের মধ্যে সম্ভাব্য সংঘাত ও বিরোধের মোকাবিলা করার কোন ব্যবস্থা ছিল

Scanned with CamScanner

না। এই সীমাবদ্ধতা সামরিক অভ্যুত্থান বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রবণতায় ইন্ধন যুগিয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো ডিরেকটরদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা। এঁদের মধ্যে একটা নেতিবাচক একতা ছিল। এরা সবাই রোবসপীয়রের ভয়ে ভীত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রশংসনীয় কিছু ছিল না। তাঁদের কোন উচ্চ আদর্শ ছিল না। পারস্পরিক বোঝাপড়ারও অভাব ছিল। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন অযোগ্য, অপদার্থ ও স্বার্থান্বেষী। ডেভিড টমশনের মতে দুর্নীতিপরায়ণ ডিরেকটরদের জন্য বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল। তাঁর ভাষায়—"They (the directiors) presid ded over the final liquidation of the Revolution". অপদার্থতা ও অযোগ্যতার জন্য ডিরেকটরি জনপ্রিয় ছিল না এবং ডিরেকটরগণ তাদের অস্তিত্বের জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছিল। এই ভাবেই নেপোলিয়ানের অভ্যুত্থান সম্ভব হ'য়েছিল।

**ডিরেকটরির অভ্যন্তরীণ নীতি ঃ** বুর্জোয়া শ্রেণীর একটি ভগ্নাংশের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ও তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে ডিরেকটরি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেনি। একের পর এক সমস্যা ও বিদ্রোহ গোড়া থেকেই ডিরেকটরির ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। বস্তুতঃ ডিরেকটরির শাসন দাঁড়িয়েছিল চোরা বালির উপর। ডিরেকটরদের নীতি ছিল পর্যায়ক্রমে দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বামপন্থী জেকোবিনদের এবং উগ্র বামদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের ব্যবহার করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। কিন্তু দীর্ঘদিন এভাবে চলা সম্ভব ছিল না, সম্ভব হয়ও নি। তবু অবস্থা সামাল দিতে তাঁরা সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। সেনাবাহিনীর উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা শেষপর্যন্ত তাদের কাল হ'য়েছিল।

ডিরেকটরি যখন ক্ষমতাসীন হয়, তখন ফ্রান্সে এক চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছিল। জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছিল। ১৭৯৪ সালে ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আইন (Law of Maximum) কার্যত প্রত্যাহার করা হয়েছিল। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পরিবর্তে অবাধ অর্থনীতি গৃহীত হ'য়েছিল। অ্যাসইনটের মূল্য কমতে কমতে ১৭৯৫ সালের মে মাসে তা দাড়ায় সাড়ে সাত শতাংশে। কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা তৈরী হয়। মজুরীর হার অবশ্যই বেড়েছিল; কিন্তু মূল্যবৃদ্ধির তুলনায় অনেক কম। কিন্তু একদিকে যেমন অভাব ও দুঃখ দারিদ্রে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হ'য়ে উঠেছিল, চোর, ডাকাত ও ভবঘুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি কিছু বুর্জোয়ার হাতে প্রচুর টাকা জমছিল। অগ্নিগর্ভ এই পরিস্থিতিতে জেকোবিনরা পুনরায় সক্রিয় হ'য়ে উঠছিল। ক্লাবগুলি নতুন করে খোলা হচ্ছিল এবং বেবিউফের (Babeuf) 'Triban du peuple' পত্রিকাটি নতুন করে প্রকাশিত হতে থাকে। এদিকে অর্থনৈতিক সংকট এমন চরম আকার ধারণ করে যে, এ্যাসইনটের জায়গায় নতুন মুদ্রা চালু করতে হয়। কিন্তু তারও পতন হয়। এই অবস্থা বেবিউফের 'আদিম সাম্যবাদী' আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। তাঁর নেতৃত্বে 'Conspiracy of the Equals' আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একটি সাম্যবাদী বা Communist সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের এটি-ই ছিল সর্ব প্রথম প্রচেষ্টা। ১৭৯৬ সালের মে মাসে সংগঠিত বেবিউফ আন্দোলনই ছিল ফরাসী বিপ্লবের শেষ ঘটনা। বেবিউফ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ১৭৯৫ সালের সংবিধানের পরিবর্তে ১৭৯৩ সালের সংবিধান চালু করা এবং ধনী দরিদ্রের পার্থক্য ঘুচিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। ১৭৮৯ সাল থেকেই বেবিউফ অর্থনৈতিক সাম্যের বাণী প্রচার করে আসছিলেন। সবাই সমস্ত জিনিস ভাগ করে নিক— এই ছিল তাঁর আদর্শ। রোবসপীয়রের পতনের পর এই আর্দশ অবাস্তব বলে তাঁর কাছে মনে



হয়। এর পর তিনি উৎপাদন ও দ্রব্যসামগ্রীর উপর যৌথ মালিকানার কথা বলতে থাকেন। যাই হোক আন্দোলনকারীরা পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেও এই আন্দোলনের শরিক করতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হ'য়েছিল। আন্দোলনকারীদের মধ্যেই পুলিশের চর ছিল এবং আন্দোলন শুরু হবার আগেই এর নেতাদের গ্রেপ্তার করা হ'য়েছিল। ৩০ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বেবিউফ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকারীদের এক বছর বাদে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই আন্দোলন জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন এক প্রবাদবাক্যে পরিণত হ'য়েছিল; বেবিউফ শ্বেত সন্ত্রাসের শহীদরূপে বন্দিত হ'য়েছিলেন। ডেভিড টমশনের মতে বেবিউফের আন্দোলন ও তার গুরুত্বকে নিয়ে অনেকেই বাড়াবাড়ি করেছেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা ও গৌরবের চেয়ে বেশিই তিনি পেয়েছেন। এ কথা অবশ্য সত্য যে, ঠিক তখনই সাম্যবাদী কোন আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। এই আন্দোলন তাই ব্যর্থ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না, যদিও পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব ছিল ও জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল ব্যাপক। আসলে এই আন্দোলন শুরু হবার আগেই সাঁ কুলোৎদের দমন করায় এবং তাদের বৈপ্লবিক উন্মাদনা নিঃশেষিত হওয়ায় তাদের পক্ষে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই বেবিউফ আন্দোলন কোন সুস্পষ্ট রূপ নিতে পারে নি।

তবে বামপন্থীরা নয়, ডিরেকটরির সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রীরা। রাজতন্ত্রীরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাহস ফিরে পায়। রাজতন্ত্রের অনেক সমর্থক সীমানা পার হ'য়ে আবার ফ্রান্সে ফিরে আসে। এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের হাত ছিল। ১৭৯৭ সালে যে আংশিক নির্বাচন হয়, তাতে ২১৬টি আসনের মধ্যে পুরাতন কনভেনশনের মাত্র ১১ জন সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক। আইন সভার উভয় কক্ষেই রাজতন্ত্রীর সভাপতি নির্বাচিত হয়। বস্তুতঃ ভোটাভুটির মাধ্যমে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভবনা দেখা দেয়। তবে কৃষকরা প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ না করলেও এটা কখনই চায় নি যে, চার্চ-তার হারানো ভূ-সম্পত্তি ফিরে পাক বা সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক। বিপ্লবের ফলে যে সব বুর্জোয়া আরও বিত্তশালী হ'য়েছিল, তারাও রাজতন্ত্রীদের পুর্নবাসন চায় নি। এই অবস্থায় পাঁচ জন ডিরেকটরের মধ্যে তিন জন প্রজাতন্ত্রী ডিরেকটর এর মধ্যে একজন ডিরেকটর বারাস (Barras) কিছুটা দোলাচলচিত্ত ছিলেন। অন্য দু জন রউবেল (Rewbell) এবং লা ব্যাভেলিয়ের লেপক্স (La Reveilliere-Lepeaux) অবশ্য পুরোপুরি প্রজাতন্ত্রী ছিলেন। রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা নাশ করার জন্য উদ্যোগী হন। বস্তুতঃ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এ ছাড়া অন্য কোন পথ খোল ছিল না। কিন্তু রাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তখন সাধারণ মানুষ ও জেকোবিন দলের সমর্থন আদায় করা সম্ভব ছিল না। কাজে কাজেই সামরিক বাহিনীর সাহায্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। তরুণ সেনানায়ক নেপোলিয়ান সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। নেপোলিয়ান, আর একজন সেনানায়ক ফুচে (Fouche) ও বারাসের সাহায্যের উপর নির্ভর করে প্রজাতন্ত্রীরা রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয় (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৭৯৭)। দুজন রাজতন্ত্রী ডিরেকটরকে বন্দী করা হয়। আইন সভার ২১৪ জন সদস্যকে বহিষ্কৃত করা হয়। যে সব দেশত্যাগী দেশে ফিরে এসেছিল, তারা আবার দেশত্যাগ করে। প্রজাতন্ত্রীদের জয় হলো। কিন্তু তারা যে সেনাবাহিনীর



Scanned with CamScanner

উপর কতটা নির্ভরশীল, তাও প্রমাণিত হলো। রাজতন্ত্রীদের শায়েস্তা করা হলো গায়ের জোরে, আইনের পথে বা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নয়। সুতরাং এ ঘটনাও ছিল ছোটখাটো এক ধরনের সন্ত্রাস। স্বাধীনতা পরিণত হলো প্রহসনে। ১৭৯৫ সালের সংবিধান যে অকার্যকর হ'য়ে পড়েছে, তা প্রমাণিত হলো।

১৭৯৮ সালের নির্বাচনে ডিরেকটরিকে আবার বামপন্থী জেকোবিনদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। বলা বাহুল্য এবারও বল প্রয়োগ করে, বামপন্থীদের দমন করার নীতি গ্রহণ করা হয়। ১০৬ জনের নির্বাচন বাতিল করা হয়। এইভাবে নিজেদের ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ডিরেকটরগণ অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় হ'লেও সর্বাত্মক ছিল না। যাই হোক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা আনার জন্য আগেকার কাগুজে মুদ্রার পরিবর্তে নতুন মুদ্রা চালু করা হয় এবং সমস্ত প্রকার ঋণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। কর ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও পুনর্বিন্যাস করা হয়। ভাগ্যও কিছুটা সহায়ক হয়। পর পর কয়েক বছর (১৭৯৬-৯৮) উৎপাদন ভাল হওয়ায় খাদ্য শস্যের দাম কমতে থাকে। এর ফলে সাধারণ মানুষ কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। উৎপাদকরা অবশ্য খুশী হয় নি। তবে শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হ'য়েছিল। ১৭৮৯ সালের তুলনায় উৎপাদন হ্রাস পায়। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সরকারী বাজেটও স্থিতিশীল ছিল না। আসলে সরকার অসহায়ভাবে ঠিকাদার, ফাটকাবাজ, ব্যবসাদার প্রভৃতি বিত্তশালী শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল ছিল। যাই হোক বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে ডিরেকটরি পরবর্তী সরকার কনসালেটের সংস্কারের পথ প্রশস্ত করেছিল। এদিকে ১৭৯৯ সালের নির্বাচনে কিছু সরকার পক্ষ সুবিধা করতে পারে নি। সরকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ পরাজিত হয় এবং জেকোবিনদের হাত কিছুটা শক্ত হয়। পাঁচ জন ডিরেকটরদের মধ্যে দু'জন—সাইয়েস (Sieyes) ও বারাস (Barras) সেনাবাহিনীর সমর্থনে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে নিজেদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হন। সেনানায়ক হিসাবে নেপোলিয়ান তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও জনপ্রিয়। তিনি যখন ১৭৯৯ সালের ৯ই অক্টোবর মিশর থেকে ফ্রান্সে ফিরে আসেন, তখন মিশরে তাঁর ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানো হয়। ফ্রান্সে তখন চরম নৈরাজ্য চলছিল। একদিকে রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতায় ফিরে আসার আশঙ্কা ও অন্যদিকে জেকোবিনদের পুনরুত্থান এবং সর্বোপরি ডিরেকটরির অযোগ্যতা বা অপদার্থতা এবং দ্রুত জনপ্রিয়তা হ্রাস এক রাজনৈতিক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় সাইয়েস্ যখন এক রাজনৈতিক পালাবদলের জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হলেন, তখনই নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্রের বীজ বপন করা হয়। তিনি নেপোলিয়ানের সাহায্যপ্রার্থী হন। বয়স্কদের সভাকে বশে আনতে খুব একটা অসুবিধা হন নি। কিন্তু পাঁচশতের সভা সহজে নতি স্বীকার করতে চায় নি। এই সভা নেপোলিয়ানকে 'একনায়ক' আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছিল। শেষপর্যন্ত এই সভার সদস্যদের বহিষ্কার করে ডিরেকটরি ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং সাইয়েস ও নেপোলিয়ান সহ তিনজন কনসালের নেতৃত্বে একটি নতুন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এইভাবে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

এখন প্রশ্ন হ'লো ডিরেকটরিকে ভেঙ্গে দেবার বিষয়ে নেপোলিয়ানের সাফল্যের কারণ কি? নেপোলিয়ানের অসাধারণ জনপ্রিয়তা এবং তাঁর সামরিক শক্তি অবশ্যই অনেকাংশে এর জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, নেপোলিয়ান



কোন সুপরিকল্পিত পথ ধরে অগ্রসর হন নি। এমনকি এই সময় তাঁর মনে একটা ইতস্ততঃ ভাব ও নিজের উপর আস্থার অভাব ছিল। মাথা ঠাণ্ডা করে তিনি অবস্থার মোকাবিলা করতে পারেন নি। বরং তাঁর ভাই লুসিয়েন (Lucien) তাঁর চেয়ে অনেক বেশি বিচক্ষণতা ও স্থির মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তিনিই শেষরক্ষা করেছিলেন। যাই হোক ক্ষমতা দখলের আসল চালিকাশক্তি ছিলেন সাইয়েস। তিনি অবশ্য নেপোলিয়ানকে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এটা যে তার একটা বড় ভুল, পরবর্তী ঘটনা তা প্রমাণ করেছিল। যাই হোক ডিরেকটরি সম্পর্কে জনগণের হতাশা ও অশ্রদ্ধার জন্যই নেপোলিয়ানের পক্ষে তা ভেঙ্গে দেওয়া কঠিন হয় নি। ডিরেকটরির সরকারে গোড়া থেকেই একটা স্থিতিশীলতার অভাব ছিল। এর জন্য কিছুটা দায়ী ছিল এর বিচিত্র সংবিধান আর কিছুটা দায়ী ছিল ডিরেকটরদের নীতি। যা হোক করে ক্ষমতায় টিকে থাকাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। দক্ষিণপন্থী রাজতন্ত্রী ও বামপন্থী জেকোবিনদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁদের পতনের জন্য নেপোলিয়ানের চেয়ে বোধ হয় ডিরেকটরদের অবদানই ছিল বেশি। সুযোগসন্ধানী নেপোলিয়ান সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন মাত্র।

ডিরেকটরির শাসন ব্যর্থ হ'য়েছিল। গর্ব করার মত কোন অবদান ডিরেকটরি রাখতে পারে নি। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, অনেক ঐতিহাসিকই এর সাফল্য ও ব্যর্থতার যথার্থ মূল্যায়ন করেন নি। তাঁরা এর ব্যর্থতাকেই বড় করে দেখিয়েছেন। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর কঠোর সমালোচনা করেছেন অন্ততঃ দু'জন ঐতিহাসিক—কবান (Cobban) ও লেফেভর। কবান লিখেছেন— 'The work of the Directory has perhaps been underrated and the achievements of the Consulate overrated' লেফেভরের মতে কনসালেটের শাসনে যে সব সংস্কার চালু করা হ'য়েছিল, ডিরেকটরির সময়েই সেগুলির সূচনা হ'য়েছিল। তাঁর ভাষায়— 'Although in more than one respect it (Directory) prepared the work of the Consulate, this achievement has not been given adequate recognition'. ডিরেকটরির শাসনকালে সে সব অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার চালু করা হ'য়েছিল, আমরা আগেই সেগুলির উল্লেখ করেছি। তবে বিপ্লবের অগ্রগতির পথে যে ডিরেকটরির কোন ইতিবাচক অবদান ছিল না, সে কথা স্বীকার্য। বরং এই সময়েই বিপ্লবের অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে এসেছিল।

**ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতি :** ডিরেকটরি যখন ক্ষমতায় আসে, তখনও ফ্রান্স প্রথম শক্তিসঙ্ঘের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তবে কনভেনশন হল্যাণ্ড, স্পেন ও প্রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ মিটিয়ে ফেলায় তারা এই শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করেছিল। কিন্তু তখনও সার্ডিনিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বোঝাপড়া বাকী ছিল। কনভেনশনের এই অসম্পূর্ণ কাজের দায়িত্ব বর্তেছিল ডিরেকটরির উপর। ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতি ছিল কনভেনশনের বৈদেশিক নীতির পরিপূরক।

ফ্রান্স বেলজিয়াম দখল করায় অস্ট্রিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। তাছাড়া বেলজিয়মের উপর ফরাসী প্রাধান্য ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। যাই হোক ফ্রাঙ্ক বেলজিয়াম অধিকার করায় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের অবসান হয় নি। বরং উত্তর ইটালীতে ফরাসী আধিপত্য বিস্তারের নীতি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। উত্তর ইটালীর উপর ফ্রান্সের লোলুপ দৃষ্টির একটি কারণ ছিল অর্থনৈতিক। অতীত কাল থেকেই লোম্বার্ডি,

Scanned with CamScanner

টাস্কানি, জেনেয়া ও ভেনিসের ধন সম্পদ অভিযাত্রীদের প্রলুব্ধ করেছিল। যাই হোক ইটালী অভিযানের দায়িত্ব দেয়া হয় তরুণ সেনানায়ক নেপোলিয়ানের উপর। এই অভিযানের সাফল্যই নেপোলিয়ানকে খ্যাতি ও গৌরবের পাদপ্রদীপের কাছে নিয়ে আসে। সমসাময়িক ইউরোপের কাছে নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের সাফল্য ছিল রূপকথার গল্পের মতো অলৌকিক এক কাহিনী। ১৭৯৬-৯৭ সালে তিনি ১২টি যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রত্যেকটিতে সফল হন। ১৭৯৬ সালের বসন্তকালে মনডোভির (Mondovi) যুদ্ধে সার্ডিনিয়া পরাজিত হয়। এর ফলে স্যাভয় (Savoy) ও নিস (Nice) ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাছাড়া বহুমূল্যবান শিল্পসামগ্রী গাড়ী বোঝাই হ'য়ে প্যারিসে পাঠানো হয়। এর পর ১৭৯৬ সালের নভেম্বর মাসে আরকোলা (Arcola) ও ১৭৯৭ সালের রিভোলির (Rivoli) যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া পরাজিত হয়। এই অবস্থায় অষ্ট্রিয়া ১৭৯৭ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাম্পোফর্মিওর (Campoformio) চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে পূর্বতন অষ্ট্রিয়ান নেদারল্যাণ্ডস্, রাইন নদীর বামতীরের অঞ্চলগুলি এবং উত্তর ইটালীর বিজিত অংশ নিয়ে গঠিত সিজালপাইন (Cisalpine) প্রজাতন্ত্রের উপর ফ্রান্সের অধিকার মেনে নিতে বাধ্য হয় অস্ট্রিয়া। বিনিময়ে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়াকে ভিনেসিয়া ফেরৎ দেয়। তবে তার আগে এখানকার মূল্যবান শিল্পসামগ্রী লুট করে ফ্রান্সে পাঠানো হ'য়েছিল। বেলজিয়ামের উপর ফ্রান্সের অধিকার স্বীকৃত হয়। ইটালীর যুদ্ধ পরিচালনা ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কৃতিত্বের একক দাবীদার ছিলেন নেপোলিয়ান। এর ফলে শুধু তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদাই বৃদ্ধি পায় নি, ডিরেকটরির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুবাদে এবং তাঁর সাহায্যে ডিরেকটরগণ তাদের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করায় নেপোলিয়ানের প্রভাব প্রতিপত্তি এক প্রকার অপরাজেয় হয়ে ওঠে। ডিরেক্টরির বৈদেশিক নীতি নির্ধারণও অনেকটা তাঁর ইচ্ছাধীন হ'য়ে পড়ে।

নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযান কাহিনীর আর একটি দিক হলো পোপের রাজ্য আক্রমণ। পোপ তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে টলেনসিত্তর (Tolentio) চুক্তি ফেব্রুয়ারী (১৭৯৭) করতে বাধ্য হন। এর ফলে পোপ নেপোলিয়ানকে এভিগনন (Avignon) ছেড়ে দেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ দেন। তাছাড়া ইটালীর অন্যান্য অঞ্চলের মত এখান থেকেও নেপোলিয়ান অনেক বহুমূল্য শিল্পসামগ্রী ফ্রান্সে চালান করেন।

যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে সাডিনিয়া ও অষ্ট্রিয়া প্রথম শক্তিসঙ্ঘ পরিত্যাগ করায় ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একমাত্র ইংল্যাণ্ড থেকে গেল। প্রথমে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা হ'য়েছিল। কিন্তু তা বেশি দূর এগোয় নি। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জল যুদ্ধে সাফল্যের এক প্রকার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ইংল্যাণ্ড ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি। সুতরাং নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং সেইভাবে ডিরেকটরিকে পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তি স্থাপনেও তিনি খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। অথচ তখনই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোন চুক্তি করলে তা হয়তো ফ্রান্সের অনুকূলে যেতে পারতো। এই ধরণের পরিস্থিতিতেই মিশর অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়। ১৭৯৮ সালের মে মাসে ৪০০ জাহাজ ও ৪০,০০০ সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ান মিশর অভিমুখে রওনা হন। উদ্দেশ্য ছিল মিশরকে ফরাসী উপনিবেশ রূপান্তরিত করা। তাছাড়া মিশরে ঘাঁটি স্থাপন করে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করা এবং প্রাচ্যে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাও ছিল আর একটি লক্ষ্য। নেপোলিয়ানের মিশর অভিযান সফল হ'লে যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হ'য়ে উঠবে, তা নিয়ে হয়ত সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু এই পরিকল্পনা কতদূর সফল হতে



পারে, তা নিয়ে অবশ্যই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। নৌ-যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে পাল্লা দেয়া মোটেই সহজ কাজ ছিল না। যাই হোক প্রথম দিকে নেপোলিয়ান সাফল্যের মুখ দেখেছিলেন। তিনি মাল্টা (Malta) ও আলেকজান্দ্রিয়া (Alexandria) অধিকার করে সিরিয়া (Syria) অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু এর পরই তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। ১৭৯৮ সালের আগষ্ট মাসে তিনি ইংরেজ নৌ-সেনাধ্যক্ষ নেলসনের (Nelson) হাতে আবুকির (Abukir) উপসাগরে নীল নদের যুদ্ধ (Battle of the Nile) পরাজিত হন। এর ফলে তাঁর সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। প্লেগের আক্রমণেও অনেক সৈনিক মারা যায়। নেপোলিয়ানের মিশর অভিযানের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও কম ভয়াবহ ছিল না। এর ফলে তুরস্ক ও রাশিয়া ফ্রান্সের উপর চটে যায়। নিকট প্রাচ্যে উভয় রাষ্ট্রেরই স্বার্থ এর ফলে ক্ষুণ্ণ হয়। এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে নিকট প্রাচ্যে শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তারা তা আপাতত ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। রাশিয়াও এই প্রথম বিপ্লবের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের জন্ম দেয়। প্রথমে ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও তুরস্ক এবং পরে অস্ট্রিয়া এই শক্তিসঙ্ঘে যোগ দেয়। ফ্রান্স আবার চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত হয়ে পড়ে। এদিকে নেপোলিয়ান ১৭৯৯ সালের আগষ্ট মাসে আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগ করে ইংরেজদের নজর এড়িয়ে অক্টোবর মাসে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ব্যর্থতা সত্ত্বেও কিন্তু স্বদেশে তিনি বীরোচিত অভ্যর্থনা লাভ করেন। এর পর তিনি কিভাবে ডিরেকটরিকে উৎখাত করে ফ্রান্সে রাজনৈতিক পালা বদল ঘটিয়েছিলেন, সে ইতিহাস আমরা আগে বর্ণনা করেছি।

ডিরেকটরির ইতিহাস প্রসঙ্গে ইতি টানার আগে আমরা এর বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য করবো। ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'য়েছিল—এ কথা বলা হয়তো অসঙ্গত। তবে এ কথা ঠিক যে, ডিরেকটরির ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি এবং মিশর অভিযানের ব্যর্থতা, দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ গঠন ও তার ফলে ফ্রান্সে পুনর্বার বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল, তাই শেষপর্যন্ত, ডিরেকটরির পতন ডেকে এনেছিল। যাই হোক ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে আলোচনার গোড়াতেই যে কথা বলা দরকার, তা হলো এই যে, ডিরেকটরি যখন প্রথম ক্ষমতায় আসে, তখন ফ্রান্স প্রথম শক্তিসঙ্ঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং তখনই তার পক্ষে নিজস্ব বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করার কোন সুযোগ ছিল না। হল্যাণ্ড, স্পেন এবং প্রাসিয়া প্রথম শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করে গেলেও সার্ডিনিয়া, অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মোকবিলা করা বাকী ছিল। তখন ফ্রান্সের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল এই শক্তিজোট পুরোপুরি ভেঙ্গে দেয়া এবং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। কনভেনশনের বৈদেশিক নীতির আর একটি লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমানা, অর্থাৎ আল্পস্, রাইন ও পিরেনীজ সুরক্ষিত করা। কিন্তু ডিরেকটরি প্রথম শক্তিসঙ্ঘ ধ্বংস করার সীমিত লক্ষ্যের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ইটালীতে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল এই বৃহত্তর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার প্রতীক। ইটালী অভিযান সফল হ'য়েছিল এবং তা সম্ভব হ'য়েছিল নেপোলিয়ানের সামরিক প্রতিভার জন্যই। ইটালী অভিযানের সাফল্যের ফলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হ'য়েছিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের খারাপ দিকও ছিল। এর মধ্যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ লুকিয়েছিল। এর ফলে ফ্রান্সের আগ্রাসী মনোভাব নগ্নভাবে উন্মোচিত হ'য়েছিল। ইটালী অভিযানের ফলাফল ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মারখাম (Markham) বলেছেন —"The French peace aims had been diverted from the natural frontiers'— the Rhine,

Scanned with CamScanner

the Pyrenees, and the Alps—to Itatian annexations, which meant expansion and war'।

নেপোলিয়ানের মিশর অভিযান ছিল আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তিনি জানতেন ইংল্যাণ্ডকে সরাসরি আক্রমণ করে কোন লাভ হবে না। তাই এর বিকল্প হিসাবে তিনি মিশর অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করা এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ করে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব ছিল, কিন্তু নতুনত্ব ছিল না। বস্তুতঃ এই পরিকল্পনার জন্য তিনি রেন্যাল (এর-(Raynal) Historic des Deux Indes (1780) এবং ভোলনের (Volney) Considerations sur la guerre actuelle des Tures (1788) গ্রন্থদুটির কাছ ঋণী। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'য়েছিল। তাঁর মিশর অভিযান ছিল নগ্ন সাম্রাজ্যবাদের উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে কুদের মন্তব্য হলো—"Bonaparte's Egyptian campaign was more blatantly imperialistic : it established no new institution of any permanence, slavery was left untouched, and it neither attempted nor realised any 'revolutionary objects."

ডিরেকটরির বৈদেশিক নীতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও ইউরোপের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এর একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইটালী, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, রাইনল্যাণ্ড ও স্যাভয়—যেখানেই ডিরেকটরির মাধ্যমে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, সেখানেই সেনাবাহিনী চেষ্টা করেছিল, মূলতঃ স্থানীয় জেকোবিনদের সমর্থনে, বৈপ্লবিক আদর্শের ভিত্তিতে রচিত ফরাসী আইন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে। এমন কি পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতেও সচেষ্ট উদ্যোগ নেয়া হ'য়েছিল। অনেক স্থানেই অত্যাচারী ও বিদেশী শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে বৈপ্লবিক সরকার গঠন করা হয়েছিল। সুতরাং লুণ্ঠনই সেনাবাহিনীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। স্বল্পস্থায়ী হলেও বিভিন্ন স্থানে ১৭৯৫ সালের সংবিধানের অনুকরণে সংবিধান চালু করা হ'য়েছিল। সার্ডিনিয়া, রাইনল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক দায়দায়িত্ব ও সার্ফ প্রথার অবসান ঘটেছিল। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে বিক্রী করা হ'য়েছিল। জেনোয়া, মাল্টা ও সিসিলিতে দাস প্রথার উচ্ছেদ হ'য়েছিল। এক কথায় বলতে পারি ডিরেকটরির সময় থেকেই ফরাসী বিপ্লব ক্রমশ ইউরোপীয় বিপ্লবে পরিণত হচ্ছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের বাণী ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল। সুতরাং ফ্রান্সে বিপ্লবের স্রোত মন্দীভূত হ'য়ে এলেও ইউরোপে তার ঢেউ স্পর্শ করেছিল। জিরন্দিন দল যা করতে চেয়েও পারে নি, ডিরেকটরি তার সূচনা করেছিল।

## ৩. কনসালেটের শাসন (১৭৯৯-১৮০০) : প্রশাসক রূপে নেপোলিয়ান

ডাইরেকটরির পতন ঘটিয়ে ফ্রান্সে এক নতুন শাসনতন্ত্র প্রচলন করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন অ্যাবি সাইয়েস। নেপোলিয়ানের ইটালী অভিযানের অসামান্য সাফল্য ও বিপুল জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে সাইয়েস ফ্রান্সে এক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। সংবিধান বিশেষজ্ঞ সাইয়েস নিজেই



নতুন শাসনতন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। তিনি নতুন যে সংবিধান রচনা করেন, তার মূল ভিত্তি ছিল "কর্তৃত্ব উপরতলার আর আস্থা নীচুতলার" (Authority for above and confidence form below), ১৭৮৯ সালে তিনি ছিলেন আইন সভার সর্বাত্মক ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করতেন আইন সভার হাতেই রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। কিন্তু ১৭৯৯ সালে তিনি এই নীতি থেকে বিচ্যুত হ'য়ে শাসন বিভাগের (executive) হাত শক্ত করার নীতি ঘোষণা করেন। আইন সভার ক্ষমতাকে খর্ব করে ও নেপোলিয়ানকে শিখণ্ডী খাড়া করে তিনি প্রজাতন্ত্রের ছদ্মবেশে নিজের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সাইয়েস সম্পর্কে নেপোলিয়ানের যে খুব একটা ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, তা নয়; ভবিষ্যতে তাঁর মত উচ্চকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালোভী ব্যক্তি সাইয়েসের কর্তৃক মেনে নেবেন, এমন মনে করারও কোন কারণ ছিল না। তবু সাইয়েস তাই মনে করেছিলেন। অন্যদিকে নেপোলিয়ানের দিক থেকেও এই তাৎক্ষণিক মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলার সুবিধা বুঝতে না পারার কোন কারণ ছিল না। উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ট্যালিরাণ্ড (Talleyrand)। যাই হোক প্রস্তাবিত নতুন সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক বিভাগকে শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্বাধীনতা ও আইনসভার সার্বভৌমিকতাও যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

সাইয়েসের "উপর তলা থেকে ক্ষমতা ও নীচু তলা থেকে আস্থা" নীতির ভিত্তিতে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু নতুন সংবিধানে জনসাধারণের কার্যতঃ কোন ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না। নির্বাচনে প্রাথমিক সভায় সদস্যরা তাঁদের সংখ্যার এক-দশমাংশ সদস্যকে বিভাগীয় সভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করতেন। এঁরা আবার এঁদের এক-দশমাংশ সদস্যকে নির্বাচন করে একটি জাতীয় তালিকা তৈরী করতেন। এই তালিকা থেকে গঠিত হতো সিনেট এবং সিনেট থেকে নির্বাচিত হতো ট্রিবিউনেট। জটিল এই পদ্ধতির ফলে আইন সভার ক্ষমতার সঙ্গে জনগণের কোন সরাসরি যোগাযোগ বা সম্পর্ক থাকলো না। আইনসভা চারটি কক্ষে বিভক্ত ছিল— কাউন্সিল অব স্টেট ট্রিবিউনেট, লেজিসলেটিভ বডি ও সিনেট। প্রথমটি আইনের প্রস্তাব করতো। দ্বিতীয়টি এই সব প্রস্তাব আলোচনা করতো, কিন্তু ভোট দিতে পারতো না। তৃতীয়টি প্রস্তাবগুলি আলোচনা করতে পারতো না, কিন্তু ভোট মারফৎ তা গ্রহণ করতে পারতো এবং চতুর্থটি তা চূড়ান্ত অনুমোদন বা বর্জন করতে পারতো। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় আইনসভা কার্যতঃ ক্ষমতাহীন ছিল। প্রথমে ঠিক হ'য়েছিল এক জন 'গ্রাণ্ড ইলেক্টর' (Grand Elector), যাঁকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত মনোনীত করা হবে, যদিও একমাত্র সেনেটই তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকারী ছিল, দু-জন কনসালকে নিযুক্ত ও পদচ্যুত করতে পারবেন। এই দু'জন কনসালের একজন বিদেশ দপ্তরের এবং অন্যজন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাজকর্ম স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। জাতীয় ও স্থানীয় তালিকা থেকে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসকদের নির্বাচন করার অধিকার ছিল উক্ত দু'জন কনসালের। গ্রাণ্ড ইলেক্টরের বিষয়ে নেপোলিয়ানের ঘোরতর আপত্তি ছিল এবং তিনি তা কিছুতেই মেনে নিলেন না। এ বিষয়ে সাইয়েস এর সঙ্গে নেপোলিয়ানের গুরুতর মত বিরোধ ছিল। শেষপর্যন্ত স্থির হলো প্রথম কনসাল, অর্থাৎ নেপোলিয়ানই হবেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কনসালদের কার্যক্রমের মেয়াদ ছিল দশ বছর। শেষপর্যন্ত জনমত যাচাই করার জন্য এই সংবিধান গণভোটে দেয়া হলে তা বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। পক্ষে তিন মিলিয়নের উপরে ও বিপক্ষে মাত্র ১৫৬২ টি ভোট পড়েছিল।

এই সংবিধানের প্রকৃতি কেমন ছিল, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে একজন সাধারণ মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হ'য়েছিল, তা উল্লেখ করা বোধ হয় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে। সংবিধানটি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘোষিত হচ্ছিল,

Scanned with CamScanner

তখন একজন মহিলা তাঁর প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "আমি ঘোষণার একটি কথাও শুনি নি। কি আছে এই সংবিধানের মধ্যে?" মহিলাটির প্রতিবেশীর উত্তর ছিল— "নেপোলিয়ান।" বক্তা কথাটি কিছু বাড়িয়ে বলেন নি। বাস্তবিকই এই সংবিধানে নেপোলিয়ান ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। সংবিধানটি দৃশ্যত প্রজাতান্ত্রিক হলেও আসলে তা ছিল নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্রের প্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আগেই বলেছি আইন সভা কার্যতঃ ছিল দুর্বল ও ক্ষমতাহীন। প্রশাসনে প্রথম কনসাল, অর্থাৎ নেপোলিয়ান, ছিলেন একাই একশো। অন্য দুজন কনসাল ছিলেন ঠুঁটো জগন্নাথ মাত্র। কনসালেটের শাসন চলাকালীনই নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে প্রজাতন্ত্রের সামান্য মুখোশটুকুও সরিয়ে নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। সমস্ত বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রকে দু'পায়ে মাড়িয়ে তিনি ১৮০২ সালের মে মাসে নিজেকে সারা জীবনের জন্য কনসাল রূপে ঘোষণা করেন। এর পিছনে অবশ্য জনগণের বিপুল সমর্থন ছিল এবং ভোটের মাধ্যমেই তিনি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৮০৪ সালের মে মাসে তিনি প্রজাতন্ত্রের খোলসটুকু পুরোপুরি পরিত্যাগ করে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ বছর ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। (১৭৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র একের পর এক নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অবশেষে ১৮০৪ সালে পুরোপুরি অবলুপ্ত হলো।)

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে নেপোলিয়ান কেন নিজের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঁচ বছর অপেক্ষা করলেন? যে বিপুল জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন তিনি পেয়েছিলেন, তাতে হয়ত তিনি ইচ্ছা করলে ১৭৯৯ সালেই নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করতে পারতেন। প্রতিবারই অর্থাৎ কনসালেটের সংবিধানের অনুমোদনের সময়, নিজেকে যাবজ্জীবন কনসালেটের পদে অভিষিক্ত করার সময় এবং অবশেষে ১৮০৪ সালে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার সময় তিনি বিপুল জন সমর্থন লাভ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের অন্তিমলগ্নে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হ'য়েছিল, তা পূর্ণ করার যোগ্যতা যে একমাত্র নেপোলিয়ানেরই ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই পাঁচ বছরের জন্য তাঁর এই অপেক্ষা প্রথম দৃষ্টিতে কিছুটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হতে পারে। আসলে নেপোলিয়ান উত্থান পর্বে অত্যন্ত ধীর ও সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়েছিলেন বলে মনে হয়। হয়ত তাঁর মনে কিছুটা দ্বিধা সন্দেহ ও অনাস্থা ছিল। ডিরেকটরির উচ্ছেদের সময় তাঁর মধ্যে কিছুটা ইতস্ততঃ ভাব ছিল। বরং সেই সময় অনেক ধীর ও স্থির মস্তিষ্কের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর ভাই লুসিয়েন। আসলে ফ্রান্সের মানুষ তাঁকে কতটুকু চায় বা সমর্থন করে, তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না। তিনি বোধহয় ভুলে যান নি যে, মাত্র কয়েক বছর আগেও তিনি ছিলেন নামগোত্রহীন নগণ্য একজন সৈনিক। অবশ্য তিনি যে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা, তার পরিচয় ফ্রান্সের মানুষ পেয়েছিল ডিরেকটরির শাসনের সময়। ব্যর্থতা সত্ত্বেও মিশর থেকে ফিরে তিনি যে বীরোচিত অভ্যর্থনা পান, তাতে তিনি নিশ্চয় আত্মতৃপ্ত হ'য়েছিলেন। কিন্তু শুধু এই বীরের মর্যাদা নিয়ে ফ্রান্সের সম্রাট হওয়ার সাহস হয়ত তাঁর হয় নি। তিনি বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন ফ্রান্সের মানুষের মন জয় করাই তাঁর সম্রাট পদের ছাড়পত্র। আর তা করতে হলে ফ্রান্সকে উপহার দিতে হবে এক সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা। ফ্রান্সের মানুষ যা চায়, কিন্তু বিপ্লব যা পুরোপুরি দিতে পারে নি, একমাত্র তা দিতে পারলেই ফ্রান্সের মানুষ তাঁকে মাথায় তুলে রাখবে, এই ধরণের প্রত্যয় হয়ত তাঁর হ'য়েছিল। ফ্রান্সের মানুষ দেখেছিল তাঁর প্রতিভার একটি দিক। কিন্তু তাঁর



অসাধারণ প্রতিভার অপর পরিচয় পায় নি। সে পরিচয় হলো সংস্কারক ও প্রশাসক নেপোলিয়ান। তাই ১৮০৪ সালে সংস্কারক ও প্রশাসক হিসাবে যখন তিনি ফ্রান্সের মানুষের মন জয় করলেন এবং যখন বুঝলেন যে, ফ্রান্সের মানুষ তাঁর প্রতিষ্ঠিত একনায়কতন্ত্র বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে, তখন তাঁর আর কোন দ্বিধা, সংকোচ বা সন্দেহ রইলো না। সৈনিক নেপোলিয়ান পরিণত হলেন ধমনীতে রাজরক্ত ছাড়াই ফ্রান্সের সম্রাটে।

**নেপোলিয়ানের অভ্যন্তরীণ সংস্কার :** বিপ্লব প্রসঙ্গে নেপোলিয়ান আপাত দৃষ্টিতে দুটি পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেছেন। প্রথম মন্তব্যটি হলো— "আমিই বিপ্লব", (I am the Revolution.) অপরটি হলো— "আমি বিপ্লব ধ্বংস করেছি।" (I destroyed the Revolution.) অর্থাৎ তিনি একাধারে বিপ্লবের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংস কর্তা। তাঁর এই উভয়বিধ রূপের যদি কোথাও সুস্পষ্ট সহাবস্থান হ'য়ে থাকে, তবে আমরা তা প্রত্যক্ষ করি সংস্কারক নেপোলিয়ানের মধ্যে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি ফ্রান্সের যে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন, তা যে কোন রূপকথার আলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয়। এ যাদুবিদ্যা বোধহয় একমাত্র নেপোলিয়ানের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ইতিহাস অবশ্য সত্য সত্যই কোন রূপকথা বা যাদুবিদ্যা নয়; তা বাস্তব সত্য। সম্ভবতঃ সংস্কারক রূপেই তিনি অধিকতর সফল ও ইতিহাসও তাঁকে এই জন্যই মনে রেখেছে। যোদ্ধা হিসাবে তিনি নিশ্চয় বিশ্বসেরাদের একজন। কিন্তু তাঁর বিজয় স্থায়ী হয় নি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিজের অপরাজেয় সম্মান তিনি বেশিদিন ধরে রাখতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পতন, এমন কি মৃত্যুর পরও, তাঁর অভ্যন্তরীণ সংস্কার স্থায়ী হ'য়েছিল। সুতরাং কনসালের অধ্যায় নেপোলিয়ানের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্ব।

তিনি সংস্কার কার্যে ব্রতী হলেন কেন? এর একটা বড় কারণ অবশ্যই খ্যাতির মোহ, গৌরবের আকাঙ্খা এবং অবশ্যই ফ্রান্সের মানুষের মন জয় করার বাসনা। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ও গৌরব তৃষ্ণা ছিল আকাশ ছোঁয়া। প্রাক্ রোমান্টিক যুগের রচনা তাঁকে কিছুটা কল্পনাবিলাসী করেছিল। কিন্তু তাঁকে অনেক বেশি প্রভাবিত করেছিল ইতিহাসখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সীজার বা আলেকজান্দারের জীবনকাহিনী। মনে রাখা দরকার এ যুগ ছিল ধ্রুপদী ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের যুগ। এই সব বিশ্বখ্যাত বীর পুরুষের অক্ষয় কীর্তি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। সুতরাং মানসিকতার দিক থেকে তিনি ছিলেন অতীতচারী, মোটেই আধুনিক নন। কিন্তু তিনি জন্মেছিলেন বিপ্লবের কালে। সুতরাং ইচ্ছা করলেও তিনি বৈপ্লবিক মতাদর্শকে এড়িয়ে চলতে পারতেন না বা পারেন নি। তিনি রুশোর লেখা পড়েছিলেন এবং তাঁর উপর জ্ঞানদীপ্তির প্রভাব যে একেবারে পড়ে নি, তাও নয়। কিন্তু রুশো সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। রুশোকে তিনি 'উন্মাদ' বলতে ছাড়েন নি। তিনি জেকোবিন দলের সমর্থক হলেও তাদের কাজকর্ম সব সময় সমর্থন করতেন না। একবার তিনি তাঁর ভাই জোসেফকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "The Jacobins are lunatics and have no common sense. সুতরাং বিপ্লবের যুগে জন্মালেও তাঁর মন বৈপ্লবিক ছিল না। তিনি পুরাতন স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই সমর্থন করতেন। বিপ্লবের অভিজ্ঞতা তাঁকে কিছুটা সন্দিগ্ধ করেছিল। জনগণ সম্পর্কেও তাঁর ভীতির ভাব ছিল। তাঁদের দমিয়ে না রাখলে তারা ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। মানুষ

Scanned with CamScanner

সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস কিছুই ছিল না। মানুষকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি একবার বলেছিলেন— "Men must be very bad to be as bad as I think they are." তবু মানুষকে খুশী করার জন্যই সংস্কারের প্রয়োজন। আর নেপোলিয়ন এও জানতেন যে, তিনি বিপ্লব সমর্থন করুন বা না করুন, বিগত দশ বছরের ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করা হবে নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। বিপ্লব মানুষের মনে আশা জাগিয়েছে এবং বিপ্লবের সুফল পাবার জন্য তারা প্রত্যাশী। সুতরাং ইচ্ছা না থাকলেও কিছুটা বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি এও বুঝেছিলেন যে, বিপ্লবের সব আদর্শ নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায় না। সাধারণ মানুষ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে না। তারা চায় এমন এক শাসন যাতে তাদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়। সুতরাং ভোটাধিকার নিয়ে তারা চিন্তিত নয়। ষোড়শ লুই রাজা বলেই প্রথমে তাঁর সিংহাসন ও পরে তাঁর জীবন হারান নি। তিনি অপদার্থ ও অযোগ্য রাজা ছিলেন বলেই এবং সাধারণ প্রজার আশা আকাঙ্খার প্রতি উদাসীন ছিলেন বলেই তাঁর এই শোচনীয় পরিণতি হ'য়েছিল। জনগণ স্বাধীনতার চেয়ে বড় করে দেখেছিল সাম্যকে। সুতরাং বুর্বোঁ স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে কিছু বৈপ্লবিক মতাদর্শের সংমিশ্রণের মধ্যে তিনি কোন অসঙ্গতি দেখেন নি। স্বৈরতন্ত্র বলতে তিনি রাজার স্বেচ্ছাচারকে বোঝেন নি। প্রজার ইচ্ছা অনিচ্ছার দাম তিনি দিতেন। তিনি নিজেই বলেছেন— "I wish to govern men as they want to be governed." এক কথায় তিনি চেয়েছিলেন পুরাতন ফ্রান্সের সঙ্গে নতুন ফ্রান্সের মিলন ঘটাতে, স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে বৈপ্লবিক মতাদর্শের সমন্বয় ঘটাতে এবং বিপ্লবের ক্ষতে প্রলেপ লাগিয়ে সাধারণ মানুষের মনে আস্থার ভাব জাগিয়ে তুলতে। তিনি জানতেন পাশবিক বল প্রয়োগ করে মানুষের মন জয় করা যায় না। তিনি নিজেই বলেছেন— "Brute force has never attained anything durable." সুতরাং স্বৈরতন্ত্রী হলেও সরকারকে হতে হবে জনকল্যাণকর ও প্রজাহিতৈষী। তবেই মানুষ তাঁকে আপন করে নেবে। এই দিক দিয়ে বিচার করেই লেফেভর তাঁকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন না বলেই স্বাধীনতা দেন নি। সুতরাং তিনি নিজেকে বিপ্লবের ধ্বংস কর্তা বলে ভুল করেন নি। আবার তেমনি ফরাসী বিপ্লব যা পারে নি, অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে তা করে এবং চতুর্দিকে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনিই বিপ্লবের সৃষ্টিকর্তা। এই যুক্তিতেই বলা হয় নেপোলিয়নের শাসন বিপ্লবের অবসান ঘটায় নি; বরং তা বিপ্লবকে সম্প্রসারিত ও পুনরুজ্জীবিত করেছিল। তিনি নিজেই হ'য়ে উঠেছিলেন বিপ্লবের প্রতীক।

প্রথম কনসাল রূপে ১৮০০ থেকে ১৮০৩ সালের মধ্যে নেপোলিয়ন তাঁর সংস্কার কার্যে ব্রতী হ'য়েছিলেন। বিগত দশ এগারো বছরে ফ্রান্সে কিছু সংস্কার অবশ্যই হ'য়েছিল এবং ভবিষ্যৎ সংস্কারের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হ'য়েছিল। ১৭৯১ সালের সংবিধান অনুসারে স্থানীয় শাসনে যে সব পরিবর্তন সাধন করা হ'য়েছিল স্বয়ং নেপোলিয়ন পরে তার অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন। সন্ত্রাসের সময়েও বেশ কিছু সংস্কার কার্যকরী করা হয়েছিল, যেমন মেট্রিক বা দশমিক ব্যবস্থা গ্রহণ, যোসেফ ক্যাম্বোনের (Joseph Cambon) অর্থনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি। ১৭৯৪ সালে কার্নো (Carnot) প্যারিসে একটি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করে কারিগরী শিক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন। ডিরেক্টরির শাসনকালেও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কারের কথা জানা যায়। কর ব্যবস্থার সংস্কার এই প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে মনে আসে। এমনকি ১৭৯২ থেকে ১৭৯৬ সালের মধ্যে আইনবিধি প্রণয়ন করার কাজও হাতে নেয়া হ'য়েছিল। কিন্তু এই সব সংস্কারের



প্রচেষ্টা ছিল অনেকাংশে বিক্ষিপ্ত ও পরিকল্পনাহীন। বস্তুতঃ ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে বিপ্লব পুরাতন সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো ভাঙার কাজে যতটা উৎসাহী ও সফল হ'য়েছিল, নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে ততটা তৎপর হয় নি। নেপোলিয়নই সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে কাজের জোয়ার এনেছিলেন। দক্ষ ও জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে তিনি এক বিপুল কর্মযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন ও নতুন এক গতির সঞ্চার করেছিলেন। কে কোন মত ও পথে বিশ্বাস করে, সে সবের তোয়াক্কা না করে একমাত্র যোগ্যতার মানদণ্ডে বিচার করে তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করে এক নতুন কর্ম সংস্কৃতি ও পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কারগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমে ধরা যাক তাঁর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের কথা। তাঁর প্রশাসনের মূল ভিত্তি ছিল একনায়কতন্ত্র। কনসালেটের সময়ে তিনি কিভাবে প্রজাতন্ত্রের আবরণে তাঁর একনায়কতন্ত্র ঢেকে রেখেছিলেন, তা আমরা আগে দেখেছি। বিপ্লব চলাকালীনই মন্ত্রীমণ্ডলীর পুনর্গঠন করা হ'য়েছিল এবং তা ঢেলে সাজানো হ'য়েছিল। নেপোলিয়ন তা বজায় রেখেছিলেন। তাঁর সময়েই অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীত্বের উদ্ভব ঘটেছিল। একনায়কতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে দক্ষ পুলিশী ব্যবস্থার উপর। নেপোলিয়ন পুলিশ মন্ত্রীর প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তিনি একটি কেন্দ্রীয় মহাদপ্তর (secretariat) প্রতিষ্ঠা করে তার মারফৎ মন্ত্রীদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করতেন। পুলিশের দায়িত্ব তিনি দেন পরবর্তী সন্ত্রাসবাদী নেতা ফুশের (Fouche) হাতে। বিদেশ দপ্তর ছিল ট্যালিরাঁর (Tallyrand) দায়িত্বে। লুসিয়েন বোনাপার্টের দপ্তর ছিল অভ্যন্তরীণ শাসন এবং অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন গোদিন (Gaudin)। বিভিন্ন মন্ত্রী দপ্তরেও কিন্তু মন্ত্রীসভা বা cabinet বলে কিছু ছিল না। নেপোলিয়ন মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে পরামর্শ করতেন। তাঁদের পরামর্শ বা উপদেশ নেয়া এবং নির্দেশ দেয়া ছিল সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছাধীন। নেপোলিয়নের শাসন ছিল দক্ষতা ও কার্যকারিতার প্রতীক। তাঁর এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে আমরা চতুর্দশ লুইয়ের স্বৈরতন্ত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। তবে তাঁর শাসন চতুর্দশ লুইয়ের শাসনের থেকেও অনেক বেশি দক্ষ ছিল। নেপোলিয়নের প্রশাসন কাঠামোর কেন্দ্রে ছিল Council of State। এটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল এবং যে, যে বিষয়ে অভিজ্ঞ বা বিশেষজ্ঞ, তাকে সেই দায়িত্ব দেয়া হতো। নেপোলিয়ন নিজে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে অন্য বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বার করতে পারতেন ও তাঁদের কদর করতেন। তবে তাদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা যা কিছু করার তা নেপোলিয়ন নিজে করতেন। নেপোলিয়নের পতনের পরও তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক এই কাঠামো মোটামুটি অবিকৃত ছিল।

স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন বুর্বো আমলের কেন্দ্রীকরণ নীতি পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, জননিরাপত্তা সমিতির সময় থেকেই স্থানীয় শাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বড় আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। ডিরেক্টরির সময়ে স্থানীয় শাসন যথেষ্ট দুর্বল ও দুর্নীতিপূর্ণ হ'য়ে পড়েছিল। যাই হোক নেপোলিয়ন স্থানীয় শাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। ১৭৯১ সালের সংবিধানে স্থানীয় শাসনের যে কাঠামো গড়ে তোলা হ'য়েছিল, নেপোলিয়ন তা মোটের উপর অবিকৃত রাখেন। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন নীতি গ্রহণ করেন। এর ফলে জনগণ তাদের নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নির্বাচিত কাউন্সিল অবশ্য নামে মাত্র থেকে গেল। উপদেশ দেয়া ছাড়া কার্যতঃ তাদের কোন ক্ষমতাই রইলো না। বছরে ১৫ দিনের বেশি এদের কোন অধিবেশন বসতো

Scanned with CamScanner

না। এক কথায় নেপোলিয়ান কর্তৃক নিযুক্ত প্রিফেক্ট (prefect) এবং তাদের অধীনস্থ সাবপ্রিফেক্ট (sub-prefect) ছিল স্থানীয় শাসনের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা। সাবপ্রিফেক্টরা স্থানীয় মানুষ হলেও প্রিফেক্টরা তা ছিল না। প্রিফেক্টদের মূল কাজ ছিল জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকে লক্ষ্য করা। তা ছাড়া ভোটের সময় জনগণ যাতে সরকারের পক্ষে ভোট দেয়, সে দিকেও তারা নজর রাখতো। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনী গড়ে তোলাও তাদের কাজের মধ্যে পড়তো। এক কথায় স্থানীয় শাসকদের উপর কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণ ছিল নিরঙ্কুশ। তোকভিলের (Tocqueville) মতে প্রিফেক্টদের মাধ্যমে যেন প্রাক্‌বিপ্লব যুগের স্থানীয় শাসক ইনটেনড্যান্টদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছিল। কোব্যান মনে করেন ইনটেনড্যান্টদের তুলনায় প্রিফেক্টরা সম্ভবতঃ কম কর্মক্ষমতা ও স্বাধীনতা উপভোগ করতো।)

ডেভিড টমসনের মতে পূর্বতন শাসনব্যবস্থার 'ক্যান্সার' (cancer) ছিল অর্থ ব্যবস্থা ও করপ্রথা। সুতরাং এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে ফ্রান্স যত শীঘ্র আরোগ্য লাভ করে, নেপোলিয়ান গোড়ার দিকেই সেদিকে নজর দিলেন। অর্থনৈতিক সংস্কারের দায়িত্ব ছিল গোদিনের (Gaudin) হাতে এবং সেই দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনার জন্য ১৮০০ সালে Bank of France প্রতিষ্ঠিত হয়। এর খসড়া তৈরী করেন প্যারিসের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার পেরেগক্স (Perregaux)। প্রথমে এটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও গোড়া থেকেই এই ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণ ও নিয়মিত কর জমা নেবার কাজ করতো। ১৮০৩ সালে এই ব্যাঙ্ককে নোট জারী করার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হয়। অন্যদিকে কর আদায়ের ব্যবস্থাও কেন্দ্রীভূত করা হয়। নেপোলিয়ান কর আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এদিকে ১৮০২ সালে ফ্রান্সের বাজেটে আয় ব্যয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। তবে এই সাফল্য ছিল স্বল্পস্থায়ী। তাঁর অর্থনৈতিক নীতি ও সংস্কারের ক্ষেত্রে যে বিপ্লবের প্রভাব পড়েছিল, নেপোলিয়ান নিজে তা স্বীকার করেছেন। কর ব্যবস্থা ও মুদ্রা সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি বৈপ্লবিক, অর্থনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকেও তাঁর নজর ছিল। মেলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে তিনি শিল্পের উন্নতির জন্য উৎসাহ দান করেছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল ডিরেকটরি। যাই হোক সামগ্রিকভাবে তিনি বুর্বো আমলের অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও অব্যবস্থা দূর করতে সযত্ন প্রয়াস করেছিলেন। তবে অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি সব সময় প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি প্রাক্‌বৈপ্লবিক চিন্তাধারার দ্বারাও প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। যদিও তিনি বুর্জোয়াদের প্রতি সদয় ও তাদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন, তবুও সব সময় তিনি উদার অবাধ নীতি (laissez-faire) অনুসরণ না করে মার্কেনটাইল নীতি অনুসরণ করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের চেয়েও তিনি কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অন্যদিকে বিপ্লবের কয়েকটি অর্থনৈতিক সংস্কার বাতিল করে তিনি প্রাক্ বিপ্লব যুগের কিছু কিছু ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। ১৭৯১ সালে বাণিজ্য সভাগুলি (chamber of commerce) স্থগিত রাখা হলেও ১৮০৩ সালে ২২টি বাণিজ্য সভার অস্তিত্ব ছিল। প্রাক্-বিপ্লব যুগের কর ব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল প্রত্যক্ষ করের পরিবর্তে পরোক্ষ করের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক। নেপোলিয়ান এই নীতিও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর সময়ে মদ ও নুনের উপর অত্যধিক হারে কর চাপানো হ'য়েছিল। এর ফলে সাধারণ লোকের খুব অসুবিধা হ'য়েছিল।

নেপোলিয়ানের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাঁর আইন সংস্কার। তাঁর নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও তিনি তা ব্যক্তও করেছিলেন যে, তাঁর আইনবিধি চিরস্থায়ী



হবে। বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে কোন বিধিবদ্ধ আইন ছিল না। এক এক জায়গায় এক এক রকম আইন প্রচলিত ছিল। বিচার ব্যবস্থায় কোন শৃঙ্খলা ছিল না। তাই বিপ্লবের শুরু থেকেই আইন সংস্কারের কথা ভাবা হ'য়েছিল। ১৭৯২ সালে কনভেনশনের রাজত্বকালে আইনের খসড়া রচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হ'য়েছিল। ১৭৯৬ সালেও একটি পরিকল্পনা রচনা করা হ'য়েছিল, কিন্তু নেপোলিয়ানের সময়েই এই বিষয়ে একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। ১৮০০ সালে নেপোলিয়ান আইন বিধি রচনা করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট আইনজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কাউন্সিল অফ স্টেটের মাধ্যমে নেপোলিয়ান তাঁর আইন বিধি রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। আইনের খুঁটি নাঁটি বিভিন্ন বিষয় আলোচনার জন্য মোট ৮৪টি অধিবেশন বসেছিল, যার মধ্যে নেপোলিয়ান নিজে ৩৬ টি অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেছিলেন। দীর্ঘ পরিশ্রমের পর অবশেষে ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ানের আইনবিধি বা কোড নেপোলিয়ান রচিত হয়। ১৮০৭ সালে এই আইনবিধি 'নেপোলিয়ান কোড' নামে নতুন করে নামাঙ্কিত করা হয়। নেপোলিয়ানের আইনবিধির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই যে, এর মধ্যে একদিকে যেমন বিপ্লবের আদর্শ, যথা আইনের দৃষ্টিতে সবাইকে সমানভাবে দেখা, সম্পত্তির অধিকার, বিপ্লবের ভূমিব্যবস্থা ইত্যাদি তুলে ধরা হলো, অন্যদিকে তেমনই রোমান আইনের নীতিগুলিকেও গ্রহণ করা হলো। অর্থাৎ বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও রোমান আইনের মধ্যে তিনি এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করলেন। ডিরেকটরির রাজত্বকালে ফ্রান্সের সমাজে যে নৈতিক অবক্ষয় ও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল, আইনের মারফৎ তা দূর করার জন্য নেপোলিয়ান তৎপর হন। এক্ষেত্রে পারিবারিক জীবনে রোমান আইনের সর্বাত্মক কর্তৃত্বের প্রবণতা তাঁর মনঃপুত হ'য়েছিল। তাই আইনবিধির মাধ্যমে যেমন সাম্যের আদর্শ ও সম্পত্তির পবিত্রতা স্বীকৃত হলো, তেমনই পারিবারিক জীবনে পুরুষের প্রাধান্য স্থাপিত হলো। বিবাহিতা মহিলাদের স্বামীর উপর নির্ভরশীলতা নিশ্চিত হলো। বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্র সংকুচিত করা হলো। স্বামীরা ইচ্ছা করলে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে কয়েদখানায় পাঠাতে পারতো। অবৈধ সন্তানের স্বীকৃতি নিরুৎসাহিত করা হলো। সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত পরিবারের বাইরে কাউকে দেয়া যাবে। নেপোলিয়ানের আইনবিধি ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষক সহ অধিকাংশ মানুষকে খুশী করে। এই আইনবিধি মারফৎ নেপোলিয়ান বিপ্লবের সুফলগুলি ফ্রান্সের মানুষের হাতে তুলে দেন। লেফেভর এই আইনবিধির প্রশংসা করে বলেছেন— "The civil code became the Bible of the society." গোদেশত (Godechot), হিসলপ (Hyslop) ও দাউদ (Dowd) আইনবিধির প্রশংসা করে বলেছেন যে, এর ফলে বিপ্লব যে সামাজিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, তার বিজয় সম্পূর্ণ হ'য়েছিল। যাই হোক আইনবিধি প্রণয়নে নেপোলিয়ানের ব্যক্তিগত অবদান বড় কিছু ছিল না। পেশাদার আইনজীবীরাই এর জন্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। তবে নেপোলিয়ান তাঁদের দিয়ে যেভাবে সমস্ত কাজ করিয়ে নিয়েছিলেন, তা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

নূতন ও পুরাতন মতাদর্শের যে সুষ্ঠু সমন্বয় নেপোলিয়ান তাঁর কোড নেপোলিয়ান মারফৎ তুলে ধরতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তাঁর ধর্মনৈতিক সংস্কারের মধ্যে কিন্তু সেই ধরণের কোন ছাপ ছিল না। চার্চ ও যাজকদের বিষয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ দিনের অভিযোগ ছিল। কিন্তু চার্চ সম্পর্কে বিপ্লবের নীতি কোনদিনই বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল না এবং বিপ্লব ধর্মীয় সমস্যার কোন সন্তোষজনক মীমাংসা করতে পারে নি। ১৭৯১ সালে সংবিধান সভা civil constitution of the clergy র মাধ্যমে যে ধর্মনীতি গ্রহণ করেছিল, তা শুধু পোপকেই অসন্তুষ্ট করে নি, ফ্রান্সে তা এক ধর্মীয় বিচ্ছেদ

বা অনৈক্যের সৃষ্টি করেছিল। কনভেনশনের আমলে যারা এই সংস্কার মানতে চায় নি, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ'য়েছিল। এর ফলে ফ্রান্সে গৃহ বিবাদ পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল। রোবসপীয়ের এই ধর্মীয় অনৈক্য ও বিরোধের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে এক পরম পুরুষের আরাধনার আদর্শ (cult of the supreme Being) তুলে ধরে ধর্মীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পতনের পর ধর্ম জীবনে সহনশীলতার আদর্শ গ্রহণ করা হ'য়েছিল। এই অবস্থায় নেপোলিয়ান তাঁর পরামর্শদাতাদের মতামতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে নিজস্ব পথে পোপের সঙ্গে ১৮০১ সালে এক বোঝাপড়ায় আসেন। ব্যক্তিগতভাবে নেপোলিয়ান ধর্মের প্রশ্নে ভলতেয়ারের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এবং চার্চবিরোধী মনোভাব পোষণ করলেও ধর্মনৈতিক দৃষ্টিকোণে নয়, রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই তিনি ধর্মনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি চার্চের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন— "The people must have a religion and that religion must be in the hands of the government". তিনি জানতেন যে অনেকেই, বিশেষ করে কৃষকেরা, ক্যাথলিক ধর্ম, চার্চ এবং ধর্মযাজকদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি অনেক বুদ্ধিজীবীও মনে করতেন যে, বিপ্লবের ফলে চতুর্দিকে যে নৈরাজ্য ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, তার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল চার্চ ও ধর্ম সম্পর্কে মানুষের অশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসহীনতা। যাই হোক ১৮০১ সালে পোপের সঙ্গে যে বোঝাপড়া হলো, তাতে ক্যাথলিক ধর্মকে ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বলে স্বীকৃত দেয়া হলো। পুরাতন সমস্ত বিশপ পদত্যাগ করলেন এবং তাদের জায়গায় নতুন বিশপদের নিয়োগ করা হলো। প্রথম কনসাল বিশপদের মনোনয়ন করলেন। কিন্তু পোপ তাঁদের চূড়ান্ত নিয়োগ করলেন। আরও স্থির হলো যে, বিশপ ও যাজকেরা সরকার থেকে বেতন পাবেন। চার্চের যে ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'য়েছিল, তা কিন্তু ফিরিয়ে দেয়া হলো না। ধর্মের ক্ষেত্রে সহনশীলতার আদর্শ গৃহীত হলো। নেপোলিয়ানের ধর্মীয় সংস্কার কিন্তু সফল হয় নি। ধর্মীয় বিরোধ বন্ধ করা যদি তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হ'য়ে থাকে, তবে যা ঘটেছিল, তা ঠিক তার বিপরীত। তাঁর ধর্মীয় সংস্কার কাউকেই খুশী করতে পারে নি। ৯৩ জন বিশপের মধ্যে ৩৮ জন বিশপ পদত্যাগ করতে অস্বীকৃত হন। পোপও নেপোলিয়ানের মনোনীত কয়েক জন বিশপকে স্বীকৃতি দেন নি। নেপোলিয়ানের ধর্মীয় সংস্কারের সমালোচনা করে ডেভিড টমশন মন্তব্য করেছেন— "The ecclesiastical settlement proved to be among the less durable of his (Napoleon's) achievements. It alitenated many devout Catholics as well as the more violent anti clericals. It was not a synthesis, as were the legal codes, but a compromise; and like many compromises it left both extremes actively dissatistifed." কোব্যানও নেপোলিয়নের সমালোচনা করে বলেছেন যে, এর ফলে তিনি চার্চের সঙ্গে যে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তা ক্ষণস্থায়ী হ'য়েছিল এবং তা মোটেই নির্ভরযোগ্য ছিল না। শেষপর্যন্ত চার্চেরই হাত শক্ত হয়েছিল এবং তা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকতে চায় নি। পরবর্তীকালে ফ্রান্সে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হ'য়েছিল, তার জন্য নেপোলিয়নের ধর্ম সংস্কার অনেকাংশে দায়ী ছিল বলে কোব্যান মন্তব্য করেছেন। কোব্যান অবশ্য নেপোলিয়নের ধর্ম সংস্কারের ভাল দিকটিও তুলে ধরে বলেছেন— "The Concordat was a great victory for Bonaparte and a master-stroke of policy. The Emperor was able hence forth to use the clergy as an instument of government."



নেপোলিয়ানের শিক্ষা সংস্কারের মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই নারীজাতির প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা ও অভক্তিও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম ও চার্চকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিলেও শিক্ষার উপর চার্চের নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিপ্লবের সময় ফ্রান্সের পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়লেও তার জায়গায় বিকল্প কোন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। কিছু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় অবশ্য স্থাপিত হ'য়েছিল; কিন্তু সেখানে যে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তা নেপোলিয়ানের মনঃপুত ছিল না। তিনি যে ধরণের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে মানবিক বা উদারপন্থী শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যোগ্য প্রশাসক ও দক্ষ কারিগর গড়ে তোলা। তাঁর মতে নারী শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অনুগত ও কর্তব্যপরায়ণ গৃহবধূ ও জননী হওয়া। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপর খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেন পৌরসভার হাতে। ১৮০২ সালের মে মাসে প্রণীত এক বিশেষ আইন বলে শতাধিক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়কে পুনর্গঠিত করে সেগুলির দায়িত্ব একজন জনশিক্ষা নিয়ামকের (Director of Public Instruction) হাতে দেওয়া হয়। এদিকে দক্ষ প্রশাসক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ধর্ম নিরপেক্ষ পাঠক্রমের ভিত্তিতে নেপোলিয়ান অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের পুত্রদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এই সব বিদ্যালয়ে নিয়ম শৃঙ্খলা অত্যন্ত কঠোর ছিল বলে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার তাদের সন্তানদের এখানে পাঠাতো না। নেপোলিয়ান সামরিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনার জন্য পরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হ'য়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে প্রতিভার দাম দেয়া হয়, নেপোলিয়ান সেদিকেও নজর দিয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে তিনি গুরুত্ব দেন নি। সরকারী খরচ বাঁচানোর জন্য স্ত্রী-শিক্ষার দায়িত্ব তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেন। শিক্ষার পাশাপাশি ফ্রান্সের যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জীবন ও অর্থের নিরাপত্তা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, নেপোলিয়ান তার জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। চুরি ডাকাতি প্রায় ছিলই না। জনকল্যাণকর কাজের পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়। কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলেও এবং শিক্ষার জন্য উৎসাহ দেয়া হলেও জনসাধারণের স্বাধীন মত প্রকাশের কোন সুযোগ দেয়া হয় নি। সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয় নি। সরকার বিরোধী পত্রপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হ'য়ে যায়। বস্তুতঃ সংবাদপত্রগুলি ছিল সরকারের প্রচার মাধ্যম মাত্র। নাটক ও নাট্যশালাগুলির উপর পুলিশী নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে যে সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সম্ভব নয়, তা বলা বাহুল্য। অথচ নেপোলিয়ান নিজে শিল্পরসিক ছিলেন এবং শিল্পকলার সমাদর করতেন। তিনি ইটালী ও মিশর থেকে বহু অমূল্য শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

নেপোলিয়ান যে পুরাতনতন্ত্রের সব কিছু পরিত্যাগ করেন নি, তার একটা প্রমাণ হলো অনেকের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর একক প্রচেষ্টায় লিজিয়ন অব অনার (Legion of Honour) নামে এক ধরণের নতুন অভিজাত শ্রেণী গড়ে তোলার প্রয়াস। এই অভিজাত সম্প্রদায় অবশ্য জন্মের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় নি। আসলে Legion of Honour ছিল এক ধরণের উপাধি এবং একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতেই এই সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করা হতো। প্রথম কনসাল, অর্থাৎ নেপোলিয়ানের সভাপতিত্বে একটি

Scanned with CamScanner

"গ্রাণ্ড কাউন্সিল"(Grand Council) এই উপাধিকারীদের নির্বাচিত করতো এবং সরকার থেকে তাদের ভাতা দেয়া হতো।

মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে একের পর এক সংস্কারের মাধ্যমে নেপোলিয়ন যেভাবে ফ্রান্সের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন, তা বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য। বস্তুতঃ বিগত দশ বছরে ফরাসী বিপ্লব বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত ও উত্থান পতন সত্ত্বেও যে সব সংস্কার কার্যকরী করতে পারে নি, নেপোলিয়ন তা অনায়াসে করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অনায়াস সাফল্যের কারণ কি? বিপ্লবের সময় থেকেই বেশ কিছু সংস্কারের কাজে হাত দেয়া হ'য়েছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য অর্জন করাও গিয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা ছিল বিক্ষিপ্ত ও পরিকল্পনাহীন। নেপোলিয়নই প্রথম সংস্কারের কাজে উঠে পড়ে লাগেন এবং তার জন্য এমনকি তিনি ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি (১৮০২) স্বাক্ষর করে নিজেকে যুদ্ধ পরিচালনার কাজ থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ মন প্রাণ দিয়েই তিনি সংস্কারের কাজে লেগেছিলেন। প্রশাসক হিসাবে অকুণ্ঠ প্রশংসা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। একজন বড় মাপের প্রশাসকের যা যা গুণ থাকা দরকার যথা—দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দক্ষতা, প্রতিটি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করার বা তার খুঁটিনাটি সব কিছু বোঝার সহজাত প্রতিভা ইত্যাদি— সব কিছুই তাঁর ছিল। তিনি ফ্রান্সকে অন্তর থেকে ভালবাসতেন। ফ্রান্সের ভাল করাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি গর্ব করে বলেছিলেন— "It is not as a general that I am governing France, it is because the nation believes that I possess the civil qualities of a ruler." তাঁর এই দম্ভোক্তির মধ্যে কিন্তু কোন অতিশয়োক্তি নেই। শাসক হিসাবে তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ নেতৃত্ব দেবার অসাধারণ ক্ষমতা। নিজে হাতে তিনি যত না করেছেন, তার চেয়ে বেশি তিনি করিয়ে নিয়েছেন অন্যদের দিয়ে। তাঁর লক্ষ্য ছিল যোগ্যতম ব্যক্তিকে, তা সে তাঁর অতীত বা মতাদর্শ যাই হোক না কেন, তাঁর উপযুক্ত কাজে বহাল করা। গোদিন (Gaudin) এবং পোর্তালিসের (Portalis) মত পূর্বতন রাজকর্মচারীও যেমন তাঁর সহকারী ছিলেন, তেমনই মার্লিন দ্য দুয়াই (Merlin de Douai), থিবোদো (Thibaudeaw), ত্রিলহার্ড (Treilhard) প্রভৃতি প্রাক্তন বিপ্লবীরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু কাজের দায়িত্ব যাঁর উপরই থাকুক, কাণ্ডারী ছিলেন স্বয়ং নেপোলিয়ন। ডেভিড টমসনের ভাষায়— "He (Napoleon) was the architect, they (his assistarts) the technicians."[১৮] এই ধরনের বোঝাপড়া ও সহযোগিতা যেখানে থাকে, সেখানে সাফল্য অবধারিত।

সংস্কারক হিসাবে নেপোলিয়ন যেমন অনেক প্রশংসা পেয়েছেন, তেমনই অনেকেই তাঁর কঠোর সমালোচনাও করেছেন। কারও মতে তাঁর একনায়কতন্ত্র ছিল চরম অত্যাচারী। আবার কারও মতে তা ছিল জনকল্যাণকর। কারও মতে তিনি বিপ্লবের সন্তান ও বিপ্লবের প্রতীক। আবার কেউ মনে করেন তাঁর হাতে বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছিল। রুশ বিপ্লবী ট্রটস্কির (Trotsky) মতে সামরিক বলপ্রয়োগ করে বিপ্লবকে ধ্বংস করার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হলো "বোনাপার্টি মতবাদ" বা Bonapartism'। নেপোলিয়ন নিজে অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, তিনি একই সঙ্গে বিপ্লবকে গড়েছেন এবং তা ভেঙেছেন। যাই হোক একটি বিষয়ে বোধ হয় কোন বিতর্ক নেই। তা হোল প্রশাসক হিসাবে তাঁর সাফল্য। তিনি ফ্রান্সের অধিকাংশ মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন। বিপ্লবের শেষ দিকে ফ্রান্স যখন এক চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বলে কিছু ছিল না, রাজতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র কোন পথে যে ফ্রান্সের মুক্তি, তা সাধারণ



মানুষ বুঝতে পারছিল না— এক কথায় ফ্রান্সের মানুষ যখন দিশাহারা, তখন নেপোলিয়নই একটি স্থিতিশীল সরকার গঠন করে এক চরম রাজনৈতিক সংকট থেকে ফ্রান্সের মানুষকে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর শাসন হয়ত নির্ঝঞ্ঝাট হয় নি, তাঁর পতনে হয়ত অনেক মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। তবু ফ্রান্সের ও সেখানকার মানুষের জন্য তিনি যা করেছিলেন, তার জন্য তাদের তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রশাসক হিসাবে তাঁর সাফল্য এক প্রকার নজিরবিহীন।

সংস্কারক ও প্রশাসক হিসাবে নেপোলিয়নের কৃতিত্ব বিচার করার আগে তাঁর চরিত্রের মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য এবং আপাত বিরোধের কথা মনে রাখা উচিত। ফরাসী বিপ্লব থেকে তাঁর উদ্ভব ঘটেছিল, অথচ তিনি বৈপ্লবিক আদর্শে পুরোপুরি আস্থাশীল ছিলেন না। তাঁর ধমনীতে ছিটে ফোঁটা রাজরক্ত ছিল না, তবু চতুর্দশ লুইয়ের মতই তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান বলে মনে করতেন। তাঁর শাসন বুর্বো রাজতন্ত্রের চেয়েও স্বৈরতন্ত্রী ছিল। তাঁর উত্থান প্রমাণ করেছিল বংশকৌলীন্য নয়, যোগ্যতা ও প্রতিভাই সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার একমাত্র চাবিকাঠি। অথচ তিনি নিজেই বংশকৌলীন্য অর্জনের জন্য প্রথমা স্ত্রী জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ পরিবার অস্ট্রিয়ার হ্যাবসবার্গ বংশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে অবশ্য দেখব এই সব বৈপরীত্য ও বিরোধ ছিল বাহ্য। আসলে নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল স্থির। তিনি জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। ফ্রান্সে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের অভিলাষী ছিলেন তিনি। এর জন্য যে কোন আদর্শ গ্রহণ করতে বা ত্যাগ করতে তাঁর আপত্তি ছিল না। কঠোর বাস্তববাদী ও সুযোগসন্ধানী নেপোলিয়ন স্বার্থের খাতিরে নিজস্ব মতামত বা আদর্শ পরিত্যাগ করতেও অরাজী ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ অবশ্যই একটা ছিল এবং তা কখনই প্রগতিশীল বা বৈপ্লবিক ছিল না। বরং তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি স্বাধীনতা বা সাম্য কোন আদর্শই স্বীকার করেন নি। বিপ্লবের মাধ্যমে যে এ সব আদর্শ সফল হতে পারে, তাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি নিজেই বলেছেন— "I do not believe the French love liberty and equality. They are not changed by ten years of Revolution". সাম্য ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন— "Society cannot exist without inequality of wealth and inequality of wealth cannot exist without religion." যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এতটা বিপ্লববিরোধী, তিনি যে বিপ্লব ধ্বংস করতে তৎপর হবেন, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু বিপ্লবের কোন একটি আদর্শ ধ্বংস করার ফলে যদি তাঁর উচ্চাকাঙ্খার পথ অবরুদ্ধ হয়, তাহ'লে তা করতে তিনি রাজী ছিলেন না। অর্থাৎ মানসিক গঠনের দিক থেকে বিপ্লব বিরোধী হলেও বিপ্লবের কোন আদর্শ সমর্থন করা বা তা না করার বিষয়টি তিনি চুলচেরা হিসাব করে দেখতেন এবং নিজের স্বার্থের পক্ষে যে নীতি গ্রহণ করা সহায়ক, নেপোলিয়ন তাই করতেন। মানুষের চাহিদা সম্পর্কে তাঁর একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। বিগত দশ বছরের ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নেপোলিয়ন বুঝেছিলেন যে, মানুষ স্বাধীনতার চেয়েও সাম্যকে বড় বলে মনে করে। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থায় তিনি জনগণকে স্বাধীনতা দেন নি। কনসালেটের শাসন ছিল প্রজাতন্ত্রের ছদ্মবেশমাত্র। ১৮০৪ সালে তিনি সে আবরণটুকুও খুলে ফেলেন। এই দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে বিপ্লবের ধ্বংসকর্তা বলতে আমাদের আপত্তি নেই। অন্যদিকে

তিনি কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে সাম্যের বাণী প্রচার করে সাধারণ মানুষের মন জয় করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় সব সময়েই যোগ্যতার দাম দেয়া হতো। তাছাড়া বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সে পুরাতনতন্ত্রের উপর যে সব আঘাত হানা হ'য়েছিল, সেগুলি তিনি বদলাবার কোন চেষ্টা করেন নি। যে সব বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণী ও কৃষকদের খুশী করেছিল, তাও তিনি মোটের উপর অক্ষুণ্ণ রাখেন। এই দৃষ্টিকোণে বিচার করলে আমরা তাঁকে বিপ্লবের প্রতীকরূপে স্বীকৃতি দিতে আপত্তি করতে পারি না। এমন কি ফরাসী বিপ্লব যা করতে পারে নি, তিনি তা করেছিলেন। এরিক হবস্‌বমের ভাষায়—১৯ "His (Napoleon's) perdecessors anticipated; he carried out." কাজেই নেপোলিয়ানের আবির্ভাব না ঘটলে বিপ্লব যেটুকু পরিপূর্ণতা পেয়েছিল, সেটুকুও পেত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। নেপোলিয়ান ছাড়া বিপ্লবের কথা আমরা তাই ভাবতে পারি না। বিপ্লব যেমন তাঁকে পাদপ্রদীপে এনেছিল, তেমনই তিনিও বিপ্লবের ঋণ শোধ করেছিলেন স্থায়িত্ব দিয়ে। এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। পরে আমরা দেখব শুধু ফ্রান্সেই নয়, বিপ্লবের বাণী তিনি ইউরোপেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর অভ্যুত্থান বিপ্লবের অপমৃত্যু নয়, বিপ্লবের সম্প্রসারিত রূপ।

বিপ্লব চলাকালীন ফরাসী রাজতন্ত্র অবলুপ্ত হলেও এবং শেষপর্যন্ত ষোড়শ লুই-এর করুণ পরিণতি সত্ত্বেও নেপোলিয়ান রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে রাজতন্ত্রের পতনের কারণ ছিল দুটি— (১) ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণীর দম্ভ ও (২) ষোড়শ লুই-এর অপদার্থতা। কিন্তু বুর্বো রাজতন্ত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তার প্রশংসা করতেন। মিরাবোর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে রাজতন্ত্রের সঙ্গে বিপ্লবের কোন বিরোধ নেই। একজন রাজাও বিপ্লবী নীতি গ্রহণ করতে পারতেন। সুতরাং নেপোলিয়ান পুরাতনতন্ত্রের সব কিছুই পরিত্যাগ করার পক্ষপাতি ছিলেন না। আসলে প্রশাসনে যা দরকার, তা হলো দক্ষতা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। সুতরাং রাজতন্ত্রের পতন হলেও নতুন ধরণের রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল বলে তিনি মনে করতেন। তিনি তাই করতে চেয়েছিলেন। যে কোন সরকারের ভাল কিছু গ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। ১৮৩৯ সালে তিনি বলেছিলেন— "From Clovis to the Committee of Public Safety. I embrace it all." তাছাড়া তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাধারণ মানুষ রাজতন্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে নি এবং তারা প্রজাতন্ত্র চায় না। রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যও তারা বিপ্লব করে নি। তবে নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন তার প্রতিষ্ঠিত স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হবে জন সমর্থন। কেবলমাত্র বাহুবলের সাহায্যে যে কোন শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, সে বোধ তাঁর ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন— "Brute force has never attained anything durable". তিনি মনে করতেন কেবল নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী দেশ শাসন করা যায় না; প্রজারা কি চায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। তাঁর এই ধরণের ভাবনা চিন্তার মধ্যে আমরা অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীদের মানসিকতার পরিচয় নাই। বস্তুতঃ তাঁকে আমরা নামকরা জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা দ্বিতীয় ক্যাথারিণের সঙ্গে একাসনে বসাতে পারি। অবশ্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার হিসাবে তিনি এঁদের চেয়েও বেশি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং এই জন্যই লেফেভর তাঁকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারীর মর্য্যাদা দিয়েছেন। তবে এই স্বৈরাচারী শাসন তিনি বংশানুক্রমিক সূত্রে পান নি। নিজের প্রতিভা ও যোগ্যতা দিয়েই তিনি তা অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর একনায়কতন্ত্র জনগণের উপর চাপিয়ে দিলেও তাঁর পিছনে জনসমর্থন ছিল এবং প্রথম কনসাল রূপেই হোক বা সম্রাট বলে নিজেকে



ঘোষণা করার সময়ই হোক তিনি জনমত যাচাই করে নিয়েছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জনসমর্থন অর্জন করেছিলেন। এক কথায় বলতে পারি বিপ্লবের সন্তান রূপে তিনি ক্ষমতা দখল করলেও এবং স্বৈরতন্ত্রের সুবিধা উপভোগ করলেও তাঁর একনায়কতন্ত্র দাঁড়িয়েছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর। ডেভিড টমশন তাঁকে "a crowned and anointed Jacobin usurper legitimized by the will of the soverign people" বলে অভিহিত করেছেন।

যে কোন একনায়কের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো তার অত্যাচারী শাসন। জনকল্যাণকর ও প্রজাহিতৈষী হলেও নেপোলিয়ানের শাসনও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। শেষদিকে এই কারণে তিনি কিছুটা জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। দিন দিন তাঁর শাসন পুলিশী শাসনে রূপান্তরিত হচ্ছিল। ১৮১০ সালের এক নির্দেশ বলে লেত্রি দ্য কেশে (letteres de Cachet) নামে পুরানো আমলের কুখ্যাত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আবার চালু করা হ'য়েছিল। বহু ব্যক্তিকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হ'য়েছিল এবং এর জন্য সরকারী কারাগার স্থাপিত হ'য়েছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হ'য়েছিল এবং ১৮১০ সাল নাগাদ প্যারিসে মাত্র চারটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। সরকার বিরোধী তৎপরতা রোখবার জন্য গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করা হ'য়েছিল এবং সরকার বিরোধীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হ'য়েছিল। এর ফলে অনেকেই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছিল। অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং কৃষকেরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেও তিনি শ্রমিকদের মন জয় করতে পারেন নি। মালিক শ্রমিক বিরোধে তাঁর সহানুভূতি ছিল মালিক শ্রেণীর পক্ষে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রথম দিকে এবং এমন কি বড় বড় যুদ্ধের ব্যয় বহন করার সময়ও তিনি ফ্রান্সের মানুষকে করভারে জর্জরিত না করলেও, ১৮১৩ সালে বিপুল পরিমান করের বোঝা চাপান। তবে ডেভিড টমশন আমাদের সতর্ক করে বলেছেন যে আমরা যেন তাঁর অত্যাচারকে কখনই অতিরঞ্জিত করে না দেখি, কারণ তাঁর শাসন শুধু প্রজাহিতৈষীই ছিল না, বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন একনায়কতন্ত্রের তুলনায় তা অনেক বেশি মানবিক ছিল। ডেভিড টমশন লিখেছেন— "The dictatorship of Napoleon was a utilitariam, efficient, industrious, hard-headed government. Its oppressiveness must not be exaggerated. It lacked the fanaticism and passious of the rule of Robespierre and the harsh all pervasive ruthlessness and brutality of twentieth-century dictatorships." একনায়কতন্ত্রের আবরণে যে পুরাতনতন্ত্র এবং বৈপ্লবিক মতাদর্শের সহাবস্থান সম্ভব, অভ্যন্তরীণ সংস্কারের মাধ্যমে নেপোলিয়ান তা প্রমাণ করেছিলেন। নেপোলিয়ানের মৃত্যু হলেও তিনি তাঁর সংস্কারের মধ্যেই বেঁচেছিলেন।

**কনসালেটের বৈদেশিক নীতি :** ১৭৯৯ সালের অক্টোবর মাসে নেপোলিয়ান যখন মিশর থেকে ফ্রান্সে ফিরে আসেন তখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ ভাঙ্গনের মুখে। সুইজারল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে ফ্রান্সের সাফল্য দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘে চিড় ধরিয়েছিল এবং রুশ জার পল (Paul) তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁকে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘ থেকে সরিয়ে নেন। আসলে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনই ছিল তখন নেপোলিয়ানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ান জানতেন যে তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার মূল ভিত্তি ছিল সামরিক বাহিনী। তাই সামরিক গৌরব ও সাফল্যের মাধ্যমে তিনি সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি এও বুঝেছিলেন যে, কেবলমাত্র সামরিক সাফল্যই ফ্রান্সে তাঁকে জনপ্রিয় করবে না। অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও দক্ষ প্রশাসন মারফৎ তিনি খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। কাজেই যুদ্ধ থেকে তিনি কিছুটা অবসর নিতেও চেয়েছিলেন,

Scanned with CamScanner

যাতে করে সেই সময় তিনি পূর্ণ শক্তি ও উদ্যম নিয়ে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজে মন দিতে পারেন। তাঁর দুটি উদ্দেশ্যই সফল হ'য়েছিল।

দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের মধ্যে অষ্ট্রিয়া ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তখনও চূড়ান্ত মোকাবিলা বাকি ছিল। ১৮০০ সালের মে মাসে নেপোলিয়ান তাঁর দ্বিতীয় ইটালী অভিযান শুরু করেন। এই সময়ে ফ্রান্সে তিনি এক চরম সংকটজনক অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু পর পর দুটি যুদ্ধে— জুন মাসে ম্যারেঙ্গো (Marengo) ও ডিসেম্বর মাসে হোহেনলিনডেন (Hohenlinden) — তিনি অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে অবস্থা সামলে নেন এবং বিজয় গৌরবে যখন ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন নেপোলিয়ান বীরোচিত অভ্যর্থনা লাভ করেন। এর ফলে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। অষ্ট্রিয়া নিরূপায় হ'য়ে ১৮০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লুনেভিলের (Luneville) চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এর ফলে অষ্ট্রিয়া ক্যাম্পো ফোর্মিওর সন্ধির শর্তাবলী পুনরায় স্বীকার করে নেয়। তাছাড়া উত্তর ইটালীতে সিজাল পাইন (Cisalpine) ও লাইগুরিয়ান (Ligurian) প্রজাতন্ত্র, সুইজারল্যাণ্ডে হেলভেটিক (Helvetic) প্রজাতন্ত্র ও হল্যাণ্ডে ব্যাটাভিয়ান (Batavian) প্রজাতন্ত্রের উপর ফরাসী প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। রাইন নদীর বামতীরস্থ অঞ্চল ও বেলজিয়ামের উপরও ফ্রান্সের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়া হয়। অন্যদিকে উত্তর ইটালীতে ফ্রান্সের সাফল্য নতুন পোপ সপ্তম পিয়ুসকে (Pius vii) নেপোলিয়ানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করলো। ১৮০১ সালের জুলাই মাসে এ বিষয়ে গোপন পরামর্শ শুরু হয়। এরই পরিণতি ১৮০২ সালে পোপের সঙ্গে এক বোঝাপড়া বা concordat, যার কথা আমরা আগেই বলেছি।

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের একমাত্র অপরাজিত সদস্য রইলো ইংল্যাণ্ড। প্রথম কনসাল নিযুক্ত হবার পরই নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শান্তি প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট রাজী হন নি। আসলে পিটের দাবী ছিল ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে বুর্বো রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এদিকে মাল্টা (Malta) দ্বীপের উপর আধিপত্য নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ও রাশিয়ার বিরোধের সুযোগ নিয়ে নেপোলিয়ান রুশ রাজ পলকে (Paul) হাত করতে চেয়েছিলেন। নেপোলিয়ানের কূটনৈতিক চাতুর্যের ফলে রাশিয়া দ্বিতীয়া শক্তিসঙ্ঘ ত্যাগ করেছিল। যাই হোক ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর তিনি রুশ যুদ্ধবন্দীদের বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন।

বস্তুতঃ তিনি জার পলকে এতটা হাত করেছিলেন যে, তিনি ১৮০১ সালের জানুয়ারী মাসে প্যারিসে এক দূত পাঠিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি করার প্রস্তাব করেছিলেন এবং মধ্য এশিয়া হ'য়ে ভারত আক্রমণের এক পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু মার্চ মাসে জার পলের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর সমস্ত আশা ও স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে। পরবর্তী জার আলেকজান্দার এই ধরণের পরিকল্পনার বিরোধী ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের সন্ধির পথে আর একটি অন্তরায় ছিল মিশরের সমস্যা। ইংল্যাণ্ডের কবল থেকে মিশরকে বাঁচানোর জন্য তিনি এমন কি এক নৌ অভিযানের কথাও চিন্তা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ১৮০১ সালের জুন মাসে ইংরেজরা কায়রো দখল করে নেয়। এই সব ব্যর্থতা নেপোলিয়ানকে কিছুটা হতাশ করেছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজসাধ্য নয়। অন্যদিকে রক্তক্ষয় ইংল্যাণ্ডও ফ্রান্সের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য উদগ্রীব হচ্ছিল। পিট বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউরোপীয় মহাদেশে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তখনই কোন যুদ্ধ বাঁধানো সম্ভব ছিল। অন্যদিকে জার পল কর্তৃক পুনঃপ্রবর্তিত উত্তর ইউরোপের রাজ্যগুলি



নিয়ে গঠিত "সশস্ত্র নিরপেক্ষ" (Armed Neutrality) নীতি ইংল্যাণ্ডে ভীতির সঞ্চার করেছিল। গমের দাম হু হু করে বাড়ছিল। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড কোন যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় নি। উভয় পক্ষই শান্তির জন্য ব্যাকুল হওয়ায় ১৮০১ সালের মার্চ মাসে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮০২ সালের মার্চ মাসে উভয়ের মধ্যে আমিয়েন্সের (Amiens) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্পেন ও হল্যাণ্ড এই চুক্তিতে যোগদান করেছিল। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংল্যাণ্ড সিংহল ও ট্রিনিডাড (Trinidad) পেল; কিন্তু মাল্টা ছাড়তে বাধ্য হলো। অন্যদিকে তুরস্ক মিশর পেল। ফ্রান্স নেপেলস্ ত্যাগ করলো। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার ফলে দ্বিতীয় শক্তিসঙ্ঘের বিলোপ ঘটলো। ফ্রান্সের মানুষ সম্মানের সঙ্গে শান্তি চেয়েছিল। নেপোলিয়ান তাই দিলেন। এর ফলে তিনি জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি দুই-ই পেলেন। ফ্রান্সের মানুষ তাঁকে আমৃত্যু কনসাল হিসাবে মেনে নিল। ইউরোপেও তাঁর সামরিক প্রতিভা ও কূটনৈতিক তৎপরতা প্রশংসিত হলো। নেপোলীয় সাম্রাজ্যের বীজ বোধহয় এখান থেকেই বপন করা হলো। অন্যদিকের পিট এই চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে "অত্যন্ত সুবিধাজনক এবং মোটের উপর সন্তোষজনক" (very advantageous and on the whole satisfactory) বলে অভিহিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। কিন্তু এই উচ্ছ্বাসের কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। ইংল্যাণ্ডের জনমত এই চুক্তির বিরোধী ছিল। মামসবেরী (Malmesbury) পরিহাস করে বলেন— "Peace in a weak, war in a month". ইংল্যাণ্ডের মানুষ আশা করেছিল এই চুক্তির ফলে ফ্রান্সের বাজার ইংল্যাণ্ডের কাছে মুক্ত হবে, বাস্তবে ঘটলো তার বিপরীত। দেখা গেল ১৮০২-৩ সালে ইংল্যাণ্ড থেকে রপ্তানির পরিমান কমেছে। অন্যদিকে ফ্রান্স স্পেনের কাছ থেকে লুইসিয়ানা (Louisiana) কিনে ও সান ডোমিনিগোতে (San Dominigo) অভিযান প্রেরণ করে বুঝিয়ে দিল যে, তার ঔপনিবেশিক আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় নি। স্বভাবতই ইংল্যাণ্ড তা ভাল চোখে দেখল না। তাছাড়া নেপোলিয়ান পিডমন্ট (Piedmont) ও এলবা (Elba) দখল করে এবং হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডে আক্রমণ চালিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তাঁর আগ্রাসী নীতির অবসান হয় নি। তিনি জার্মানীতেও হস্তক্ষেপ করেন। তবে নেপোলিয়ানের এই সম্প্রসারণশীল নীতি লুনেভিল চুক্তির পরিপন্থী ছিল, অ্যামিয়েন্স চুক্তির নয়। তবু ইংল্যাণ্ডের পক্ষে তা মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এমন কথাও শোনা যায় যে, নেপোলিয়ান নাকি মিশর পুনরধিকার করার কথা ভাবছিলেন। ইংল্যাণ্ড তাই রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। আমিয়েন্সের চুক্তি অনুসারে ইংল্যাণ্ডের মাল্টা ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তা অমান্য করে ইংল্যাণ্ড মাল্টা ছাড়তে অস্বীকৃত হয়। এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী শান্তির কোন অবকাশ ছিল না। ইংল্যাণ্ড হয়ত ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা মানতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তার পক্ষে ইউরোপে শক্তি সাম্যের ভাঙ্গন বা ফ্রান্সের একাধিপত্য মেনে নেয়া কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। ইংল্যাণ্ডের ভয় ছিল ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে ফ্রান্সের একাধিপত্যের ফলে সে তার জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সুসংগঠিত করে ইংল্যাণ্ডের সামুদ্রিক শক্তিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ঠেলে দেবে। তবে তখনই উভয় পক্ষ কোন ঝুঁকি নিতে না চাওয়ায় যুদ্ধ বাঁধলো না। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিতেই আমিয়েন্সের চুক্তি সাময়িক যুদ্ধ বিরতি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। আসলে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সহাবস্থান কখনই সম্ভবপর ছিল না বলে আমিয়েন্সের চুক্তির স্থায়িত্ব অসম্ভব ছিল। ফলে ১৮০৩ সালেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের আবার যুদ্ধ হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খাও সর্ব সমক্ষে উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল। এর আগে পর্যন্ত মনে হচ্ছিল নেপোলিয়ান শান্তিকামী এবং ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা সুনিশ্চিত হ'য়ে গেলেই যুদ্ধের প্রয়োজন

Scanned with CamScanner

ফুরিয়ে যাবে। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় এবং ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমিয়েন্সের চুক্তির ফলে সেইরকম একটি পরিস্থিতির উদ্ভবও ঘটেছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বোঝা গেল যে, নেপোলিয়ান ইউরোপ জয়ের স্বপ্ন, দেখছেন। সে স্বপ্ন ক্যারোলিঞ্জিয়ান (Carolingian) সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় সাম্রাজ্যের স্বপ্ন আদর্শে যা প্রাচীন যুগের রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনীয়। যাই হোক ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত নেপোলিয়ানকে শুধু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু তারপরই যখন ১৮০৫ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপে তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ গড়ে উঠলো, তখন থেকে একটানা প্রায় ১০ বছর নেপোলিয়ানকে ইউরোপীয় যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হলো। শুধু ফ্রান্সের ইতিহাসে নয়, ইউরোপের ইতিহাসে শুরু হলো নতুন এক অধ্যায়। ইউরোপ ও ফ্রান্সের ইতিহাস একাকার হ'য়ে গেল।

## সূত্র নির্দেশ


১. Taylor, A. J. P.— "Napoleon" in his "Europe: Grandeur and Decline" পৃঃ ১১
২. Church, C.— "In Search of Directory" in F. H. Bosher (ed)— French Govt. and Society, 1500-1800: Essays in memory of A. Cobban
৩. Lyons, M.— '9 Thermidor: Motives and Effects' in European studie's Review (1975) এবং France under directory.
৪. Cobban— পূর্বোক্ত Vol. I পৃঃ ২৫০ এবং Lifebvre পূর্বোক্ত Vol. 2 পৃঃ ১৬১
৫. Thomson David-পূর্বোক্ত পৃঃ ৪৫
৬. ঐ— পৃঃ ৪৬
৭. Cobban— পূর্বোক্ত Vol. I পৃঃ ২৫৭
৮. Lefebvre— পূর্বোক্ত Vol. 2 পৃঃ ২০৯
৯. Markhan, Felix— Napoleon and the Awakening of Europe পৃঃ ৪১
১০. Rude, G. পূর্বোক্ত পৃঃ ২১৫
১১. Markham— পূর্বোক্ত পৃঃ ৬০
১২ Markham— পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪
১৩. নেপোলিয়ানের নিজস্ব বক্তব্য পাওয়া যাবে তাঁর আত্মজীবনীতে। —উদ্ধৃতিগুলি নেয়া হ'য়েছে Markham -এর বই থেকে।
১৪. Thomson. D— পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৭
১৫. Lefebvre— Napoleon, Vol. I পৃঃ ১৫১
১৬. Thomson, David, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৯
১৭. Cobban— পূর্বোক্ত Vol. 2 পৃঃ ৩১
১৮. Thomson, D.— পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৭
১৯. Hobsbawn, E.J.— The Age of Revolution পৃঃ ৯৮
২০. Thomson David— পূর্বোক্ত পৃঃ ৬০
২১. ঐ —পূর্বোক্ত পৃঃ ৬১


Scanned with CamScanner

# ৪ নেপোলিয়ান ঃ উত্থান পর্ব (ইউরোপ) (১৮০৪-১৮০৭)

১৮০৪ সালে নেপোলিয়ান যখন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন, তখন ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক ও দক্ষ প্রশাসক রূপে শুধু ফ্রান্সে নয়, সমগ্র ইউরোপে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের শেষ পর্বের রাজনৈতিক শূন্যতাকে মূলধন করে তিনি আপন প্রতিভা বলে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ পদ অধিকার করে প্রমাণ করেন, জন্ম নয়, কর্মই ক্ষমতা দখলের একমাত্র চাবিকাঠি। তিনি নিজে বলেছিলেন যে, ফ্রান্সের রাজমুকুটকে ধূলায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি তা তরবারির সাহায্যে তুলে নিজের মাথায় পরেন। কিন্তু ফ্রান্সের সম্রাট পদ লাভ করেই তাঁর উচ্চাকাঙ্খার অবসান হলো না। তিনি চাইলেন ইউরোপের উপর তাঁর একাধিপত্য স্থাপন করতে। ১৮০৪ থেকে ১৮০৭ পর্যন্ত নেপোলিয়ানের জীবন ইতিহাসের মূল বিষয় হলো ইউরোপের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে কি ভাবে তিনি তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন সেই কাহিনী। মাত্র এই কয়েক বছরের মধ্যে গড়ে উঠল তাঁর সাম্রাজ্যের বিশাল বনিয়াদ। ১৮০৭ সালে তিনি তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খার অবশ্য এখানেই সমাপ্তি ঘটে নি। এর পরও তিনি অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ করেছেন। কিন্তু ১৮০৭ সালের পর থেকেই তাঁর পতন সূচিত হয়। ১৮১৫ সালে আর্থার ওয়েলেসলির হাতে ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যই ভেঙ্গে পড়লো না, তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যুও ঘটলো। বাকী জীবন তাঁর কেটেছিল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো ইউরোপের ইতিহাসের এক পর্ব; শুরু হলো নতুন এক পর্ব। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গড়তে ও ভাঙ্গতে সময় লেগেছিল মাত্র ১২ বছর— ১৮০৪ থেকে ১৮১৫। মহাকালের হিসাবে ১২ বছর কিছুই নয়। তবু ফ্রান্স ও ইউরোপের ইতিহাসে এই ১২ বছরে ঘটেছে এমন সব ঘটনা, যার তাৎপর্য অপরিসীম এবং যার প্রভাব হ'য়েছিল দীর্ঘস্থায়ী। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে সরে গেলেও নেপোলিয়ানের আত্মা যেন ইউরোপকে ভুলতে পারে নি। ইউরোপের মানুষও তাঁর গঠনমূলক আদর্শের কথা ভুলতে পারে নি। নেপোলিয়ানের উত্থান শুধু ফ্রান্সেই নয়, ইউরোপেও বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব পর্যবসিত হ'য়েছিল ইউরোপীয় বিপ্লবে। অথচ নেপোলিয়ান নিজে বৈপ্লবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং ইউরোপে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার করার কোন পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না। কিন্তু যা তিনি চান নি, অলক্ষ্যে এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে দিয়ে যেন কেউ তা করিয়ে নিয়েছিল। বৈপ্লবিক আদর্শের মৃত্যু নেই। তাই নেপোলিয়ানের পতনের পর যখন তা জোর করে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হ'য়েছিল, তখন সেই চেষ্টা শেষপর্যন্ত সফল হয় নি। বিপ্লবের যে আদর্শে নেপোলিয়ান ইউরোপকে দীক্ষিত করেছিলেন, ইউরোপের মানুষ তা ভোলে নি। সেই কারণে নেপোলিয়ানের পতন হলেও আগের অবস্থা ফিরে আসে নি এবং ইউরোপ অশান্ত ও উত্তাল হ'য়ে উঠেছিল।

Scanned with CamScanner

## নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠন

১৮০৫ সালে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘকে মাত্র দু-বছরের মধ্যে চূর্ণ করে নেপোলিয়ান তাঁর সাম্রাজ্য গঠনের কাজ এক প্রকার সম্পন্ন করেন। তাঁর সেই চমকপ্রদ সামরিক সাফল্যের ইতিহাস আলোচনা করার আগে তিনি সাম্রাজ্য গঠনে কেন ব্রতী হ'য়েছিলেন বা তাঁর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল, সে সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। উচ্চাকাঙ্খা ও ক্ষমতার লোভ নিঃসন্দেহে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল। রাজ পরিবারে জন্ম না হলেও তাঁর ধমনীতে ছিল সাম্রাজ্যবাদের নেশা। সামরিক জয় ও গৌরব এবং ক্ষমতার লোভ ছিল তাঁর সহজাত। তিনি নিজেই বলেছেন— "My mistress is power, but it is as an artist that I love power. I love it as a musician loves his violin." কাজেই তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ও আলেকজান্দার, জুলিয়াস সীজার বা শার্লামেনের মত দিগ্বিজয়ী বীর হবার স্বপ্ন শূন্যগর্ভ আস্ফালন ছিল না। সেই স্বপ্ন সফল করার মত অসাধারণ সামরিক প্রতিভা তাঁর ছিল। তিনি যে একজন অত্যন্ত বড় মাপের সামরিক নেতা ছিলেন, তা স্বয়ং তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ আর্থার ওয়েলেসলিও স্বীকার করেছিলেন। অবিরত যুদ্ধ করে এবং ভীতি প্রদর্শন করেই নেপোলিয়ান তাঁর সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর নিজের কথায়— "Conquest has made me what I am..... Abroad and at home, I reign only through the fear I inspire." কিন্তু কেবল উচ্চাকাঙ্খা ও ক্ষমতার লোভই তাঁকে সাম্রাজ্য গঠনে প্রণোদিত করেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন না। সোরেলের (Sorel) মতে বিপ্লব চলাকালীন ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা স্পর্শ করা ও তা সুরক্ষিত করার যে নীতি গ্রহণ করা হ'য়েছিল, উত্তরাধিকার সূত্রে নেপোলিয়ান তা অনুসরণ করতে গিয়ে এক সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এই অভিমত কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। নেপোলিয়ানের চরম শত্রু ইংল্যাণ্ডও ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমরেখা মেনে নিতে অরাজী ছিল না। ১৮০৩ সাল পর্যন্ত মনে হ'য়েছিল নেপোলিয়ান ইউরোপে শান্তি বজায় রাখায় আগ্রহী। কারণ ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমারেখা ঐ সময়ের মধ্যে সুনিশ্চিত হ'য়েছিল। কিন্তু এর পর থেকেই নেপোলিয়ানের আগ্রাসী ভাবমূর্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে থাকে। রুদে বলেছেন— "Once France had embarked on a policy of expanding upto and beyond her 'natural frontiers', there could be no absolute limits to her territorial claims on Europe". আবার অনেকে, যেমন ড্রিয়াল্ট (Driault) মনে করেন যে, সমস্ত ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ান তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল অতীতচারী। কেরোলিঞ্জীয় সম্রাট শার্লামেন ছিলেন তাঁর আদর্শ। শার্লামেনের মত নেপোলিয়ানও প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের মত একটি অখন্ড ইউরোপীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবাদের এই ব্যাখ্যা তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ও ক্ষমতালোভী মনোবৃত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পিটার গাইল অবশ্য ড্রিয়াল্টের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য বা কনস্ট্যান্টাইন্ ও শার্লামেনের ঐতিহ্যের দ্বারা নেপোলিয়ানের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয় নি।



তার দৃষ্টান্ত অবশ্য নেপোলিয়ানকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে নেপোলিয়ানের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের পরাজয়। নেপোলিয়ানের উচ্চাকাঙ্খার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল ইংল্যাণ্ডের বিরোধিতা। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শক্তিসঙ্ঘগুলি গড়ে তোলার পিছনে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকাই ছিল সর্বাধিক। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের দীর্ঘকালীন ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইংল্যাণ্ডের সামুদ্রিক ও নৌ-শক্তি ফরাসী উচ্চাকাঙ্খার ক্ষেত্রে একটা বড় অন্তরায় ছিল। তাই নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডের শক্তি ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইংল্যাণ্ড যে ফ্রান্সের ঘোরতর শত্রু ছিল, তা বিতর্কের ঊর্ধে। কিন্তু কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য মাথায় রেখেই নেপোলিয়ান তাঁর সাম্রাজ্য গঠনে প্রবৃত্ত হ'য়েছিলেন বলে মনে হয় না। আসলে নেপোলিয়ানের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্সের স্বার্থ রক্ষা করা। তিনি জানতেন যে, ফ্রান্সের মানুষের কাছে তাঁর একনায়কতন্ত্র গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তুলতে হলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে হলে ফ্রান্সের মানুষের মন জয় করা দরকার। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন— "My policy is France before all". বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তাঁর নিজের স্বার্থ ও ফ্রান্সের স্বার্থ একাকার হ'য়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ যখন এই উভয়বিধ স্বার্থের মধ্যে সংঘাত বেঁধেছিল, তখনই নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল হ'য়ে গিয়েছিল।

যে তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘকে চূর্ণ করে নেপোলিয়ান তাঁর সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, তা গড়ে ওঠার জন্য তিনি নিজেই দায়ী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ গঠন অনিবার্য ছিল এবং সময় ও সুযোগের উপরই তা নির্ভর করছে। তাঁর এই ধারণার কিন্তু কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ও আগ্রাসী মনোভাবের জন্যই ইউরোপ তাঁর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। তিনি যদি ইউরোপে শক্তিসাম্য ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত না হতেন, বা অন্যভাবে বলতে গেলে তিনি যদি ইউরোপে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের কথা চিন্তা না করতেন, তাহ'লে হয়ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ গড়ে উঠতো না। ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে অনেক্য তাঁকে আরও বেশি মাত্রায় উচ্চাকাঙ্খী করেছিল। অষ্ট্রিয়া নিজের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে জর্জরিত ছিল। তাছাড়া পোল্যাণ্ড ও তুরস্কে প্রাধান্য স্থাপনের প্রশ্ন নিয়ে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র মতভেদ ছিল। ১৭৯৫ সালে স্বাক্ষরিত বেসলের (Basle) চুক্তির পর প্রাশিয়া নিরপেক্ষ ছিল। রাশিয়ার সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক ভাল ছিল না। মধ্যপ্রাচ্যে রুশ আগ্রাসী মনোভাব ও করফু (Corfu) দখল ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক মালটা (Malta) জয়ও রাশিয়া মেনে নিতে পারে নি। রাশিয়া অবশ্য পশ্চিম ইউরোপে নেপোলিয়ানের আগ্রাসী মনোভাবও সমর্থন করে নি। নেপোলিয়ানের হ্যানোভার (Hanover) ও নেপেলস (Naples) দখল জার আলেকজান্দারকে চিন্তিত ও শঙ্কিত করেছিল। যাই হোক অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে অনেক্য নেপোলিয়ানকে যে কিছুটা দুঃসাহসী করেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আবার একথাও সত্য যে, নেপোলিয়ানের আগ্রাসী মনোভাব, বিশেষতঃ নেপোলিয়ান কর্তৃক নিজেকে ইটালির রাজা বলে ঘোষণা ও জেনোয়া (Genoa) দখল তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘের জন্ম দিয়েছিল। নেপোলিয়ানের এই নীতি ছিল লুনেভিলের চুক্তির উপর নগ্ন আক্রমণ। বস্তুতঃ তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘ গঠনে ইংল্যাণ্ডের চেয়েও নেপোলিয়ানের আগ্রাসী নীতি ছিল অনেক বেশী দায়ী। ১৮০৩ সালে যখন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কোন শক্তিসঙ্ঘ গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না, কারণ ইউরোপের অন্য রাষ্ট্রগুলি তখন মনে করতো ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ ছিল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে পুরানো

Scanned with CamScanner

ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার অঙ্গ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কোন উদ্যোগ নেয়া সম্ভব না হলেও জার আলেকজান্দারই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হন এবং ১৮০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পিটের (Pitt) সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, যার পরিণতি ১৮০৫ সালের এপ্রিল মাসের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন। আতঙ্কিত অষ্ট্রিয়া আগষ্ট মাসে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনে যোগ দেয়। আপাততঃ প্রাশিয়া অবশ্য নিরপেক্ষ রইল। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রিয়া ব্যাভেরিয়া আক্রমণ করায় ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। ব্যাভেরিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

এবার শুরু হলো নেপোলিয়ানের চমকপ্রদ সামরিক বিজয়— সামরিক ক্ষেত্রে অজেয় হিসাবে কিংবদন্তী নায়কের চকিত অভ্যুদয়। পর পর দুটি যুদ্ধে— অক্টোবর মাসে উলম্ (ulm) এবং ডিসেম্বর মাসে অস্টারলিজ (Austerlitz)— অষ্ট্রিয়া পরাভূত হলো। হতোদ্যম সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রান্সিস্ (Francis II) বাধ্য হলেন প্রেসবার্গের (Pressburg) চুক্তি (২৭ শে ডিসেম্বর, ১৮০৫) স্বাক্ষর করতে। এর ফলে তিনি ভিনেসিয়া (Venetia) ও টায়রল (Tyrol) হারালেন; তাছাড়া ব্যাভিরিয়া (Bavaria), বেডেন (Baden) ও উর্টেনবার্গকে (Wurtenberg) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য এইভাবে বিনষ্ট হয়। তাছাড়া ফ্রান্স পেল বিরাট ক্ষতিপূরণ। এদিকে প্রাশিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হ'য়ে অন্য দুটি অঞ্চলের বিনিময়ে (নিউচাটেল–Neuchatel ও এ্যাসপ্যাক–Anspach), হেনোভার (Hanover) লাভ করলো।

প্রাশিয়ার সঙ্গে এই চুক্তি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। প্রাশিয়া শীঘ্রই বুঝতে পারল যে, হয় তাকে ফ্রান্সের তাঁবেদার রাষ্ট্র হ'য়ে থাকতে হবে, নয় তাকে একাকী নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নেপোলিয়ান অবশ্য প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান নি। কিন্তু তাঁর ঔদ্ধত্য ও প্রাশিয়াকে তাঁর আজ্ঞাবহ রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টা যুদ্ধ অনিবার্য করে তুলল। ১৮০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেপোলিয়ান প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক উইলিয়ামকে ক্লিভস্ (Cleves) ছাড়তে বাধ্য করলেন এবং ইংল্যাণ্ড যাতে প্রাশিয়ার বন্দরগুলি ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্য চাপ দিলেন। জুলাই মাসে নেপোলিয়ান রাইন রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Confederation of the Rhine) গড়ে তুলে প্রাশিয়ার বিরাগভাজন হন। ফ্রেডারিক উইলিয়াম বুঝলেন যে, এর ফলে জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হবে। সবশেষে ফ্রেডারিক উইলিয়াম যখন ইঙ্গিত পেলেন যে, নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডকে খুশী করার জন্য হ্যানোভার (Hanover) দেবার কথা ভাবছেন, তখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। তিনি সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেন এবং ফ্রান্স যাতে তার সেনাবাহিনী রাইন অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেয়, তার জন্য এক চরমপত্র দিলেন। কিন্তু পর পর দুটি যুদ্ধে জেনা (Jena) ও অয়ারস্টাট (Auerstadt)— প্রাশিয়া পরাজিত হলো এবং নেপোলিয়ান বার্লিন অধিকার করলেন। প্রাশিয়ার সঙ্গে স্বাক্ষরিত হলো স্কনব্রনের (schonbron) চুক্তি। প্রাশিয়া তৃতীয় শক্তিসঙ্ঘে যোগদান করলেও মোটেই সুবিধা করতে পারল না। আসলে শ্লথগতিসম্পন্ন ও বয়স্ক সেনাপতিদের দ্বারা পরিচালিত প্রাশিয়া বাহিনী নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীর কাছে দাঁড়াতেই পারে নি।

অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার পরাজয়ের পর ইউরোপের স্থল শক্তিগুলির মধ্যে একমাত্র রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়ানের শক্তি পরীক্ষা বাকি ছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে নেপোলিয়ান পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ৩০,০০০ পোল সৈনিকের সহায়তা লাভ করলেন। ১৮০৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আইলাউ-এর (Eylau) যুদ্ধে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও রাশিয়াকে পরাজিত করেন। অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার



বিরুদ্ধে কিন্তু যত সহজে নেপোলিয়ন জিতেছিলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তা হয় নি। বস্তুতঃ এই সময়ে যদি ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে তাঁর বিরোধিতা করতো, তাহ'লে নেপোলিয়ান বিপদে পড়ে যেতেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়া তখনও অস্টারলিজের পরাজয়ের আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে নি। প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। ইংল্যাণ্ডের মতিগতি ও স্বার্থপর মনোবৃত্তিও রাশিয়াকে ক্ষুব্ধ করেছিল। যাই হোক ফ্রিডল্যাণ্ডের (Friedland) যুদ্ধে রাশিয়া আবার পরাজিত হয়। নেপোলিয়ান গর্ব করে বললেন— "This battle is as decisive as Austerlitz, Marengo and Jena". রুশ জার আলেকজান্দার ফ্রান্সের সামরিক বিজয়ের চেয়ে ইংল্যাণ্ড ও প্রাশিয়ার আচরণে অধিকতর ক্ষুব্ধ হ'য়ে নেপোলিয়ানের সঙ্গে শুধু সন্ধিই করলেন না, তাঁর সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হলেন; উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলো টিলজিটের (Tilset) চুক্তি (জুলাই, ১৮০৭)। এর ফলে গোটা ইউরোপকে রাজনৈতিক প্রাধান্যের ভিত্তিতে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হলো— পশ্চিমে নেপোলিয়ান ও পূর্বে আলেকজান্দার। তুরস্ক ও সুইডেনে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের সুযোগ পেয়ে রাশিয়া খুশী হলো। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মহাদেশীয় অবরোধ কার্যকরী করতেও রাজী হলেন আলেকজান্দার। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হলো প্রাশিয়ার। সে তার পোল্যাণ্ডের অংশ হারাল। গড়ে তোলা হলো নতুন দুটি রাষ্ট্র— ওয়েষ্টফ্যালিয়া ও গ্রাণ্ড ডাচি অফ ওয়ারস। ১৮০৫ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে ইউরোপের তিনটি শক্তিশালী দেশকে পরাজিত করে এবং রাশিয়াকে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ করে নেপোলিয়ান তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করলেন। ইংল্যাণ্ড ছাড়া তৃতীয় শক্তি সঙ্ঘ ধ্বংস করে নেপোলিয়ান তাঁর সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন।

অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া পরাজিত হলেও অপরাজিত রইলো ইংল্যাণ্ড। আমরা আগেই দেখেছি আমিয়েন্সের চুক্তি ক্ষণস্থায়ী হ'য়েছিল এবং ১৮০৩ সালেই ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ আবার শুরু হ'য়েছিল। এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দু-বছর। এ যুদ্ধ ছিল নৌ-যুদ্ধ। নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করা। কিন্তু তা করতে গেলে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে ফরাসী সেনা পাঠাতে হলে, উপযুক্ত নৌ-বহরের প্রয়োজন ছিল। দুঃখের বিষয় ফ্রান্সের তা ছিল না। যাই হোক নেপোলিয়ান ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার জন্য এক বিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ও সৈন্য সমাবেশ করেন। ১৮০৪ সালে স্পেন ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় নেপোলিয়ানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৮০৫ সালে ব্রিটিশ নৌ-সেনাধ্যক্ষ নেলসন (Nelson) ট্রাফালগারের (Trafalgar) যুদ্ধে ফ্রান্স ও স্পেনের মিলিত নৌ-বহরকে ধ্বংস করে দেন। এর ফলে নেপোলিয়ানের ইংল্যাণ্ড বিজয়ের পরিকল্পনা বিফল হ'য়ে যায়। আসলে বিপ্লবের সময় থেকেই ফরাসী নৌ-বহর অনেকাংশে তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল। নেপোলিয়ানের মিশর অভিযানের সময়েই তা বোঝা গিয়েছিল। বুর্বো আমলের অনেক দক্ষ সেনানায়কই অবসর নিয়েছিলেন। দক্ষ সেনাপতি লাটুস ট্রেভিল (Latouche-Treville) ১৮০৪ সালে মারা যাওয়ায় ফরাসী নৌ-বহর আরও দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। নেপোলিয়ানের চরম ব্যর্থতা এইখানে যে, তিনি কোনদিনই নৌ-যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করতে পারেন নি।

টিলজিটের চুক্তির ফলে অবশ্য নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে নি বা এখানেই তাঁর উচ্চাকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় নি। তবে ১৮০৭ সালেই তাঁর প্রাধান্য ও ক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্ত হ'য়েছিল বেলজিয়াম (Belgium), স্যাভয় (Savoy), নিস (Nice), জেনোয়া (Genoa), ডালমাশিয়া (Dalmatia) ও ক্রোয়েশিয়া (Croatia)। তাছাড়া অধীনস্থ সহযোগী রাষ্ট্র হিসাবে ছিল হল্যাণ্ড (Holland),

Scanned with CamScanner

ওয়েষ্টফ্যালিয়া (Westphalia), কনফেডারেশন অব রাইন (Confederation of the Rhine), ইটালী (Italy), গ্রান্ড ডাচি অব ওয়ারশ (Grand duchy of Warsaw) এবং সুইজারল্যাণ্ড (Switzerland)। মিত্র রাষ্ট্র হিসাবে ছিল ব্যাভেরিয়া (Bavaria), উর্টেনবার্গ (Wurttemberg), ডেনমার্ক (Denmark), সুইডেন (Sweden), স্পেন (Spain), রাশিয়া (Russia), প্রাশিয়া (Prussia) এবং অষ্ট্রিয়া (Austria)। ফ্রান্স নয়, ইংল্যাণ্ডই ইউরোপে একঘরে ও মিত্রহীন হ'য়ে পড়েছিল। এর আগে কোনদিন, এমন কি চতুর্দশ লুই-এর সময়েও, ফ্রান্স প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারে নি। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে নেপোলিয়ানের এই চমকপ্রদ সাফল্যের কারণ কি? একটা কারণ অবশ্যই নেপোলিয়ানের সামরিক প্রতিভা। তিনি শুধু অসাধারণ বীরই ছিলেন না, সেনাবাহিনীকে অনুপ্রাণিত করতে বা নেতৃত্ব দিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সেনাবাহিনীর মনে আস্থা সঞ্চার করতে তাঁর উপস্থিতিই ছিল যথেষ্ট। ডিউক অব ওয়েলিংটন (আর্থার ওয়েলেসলি) স্বীকার করেছিলেন যে, নেপোলিয়ানের উপস্থিতি যে নৈতিক সাহস জোগাতো, তা ৪০,০০০ সৈনিকের সম্মিলিত শক্তির সমতুল। তবে কেবলমাত্র ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব বা প্রতিভা দিয়ে এতখানি সফল হওয়া যায় না। বুর্বো শাসনের শেষ দিকে যে সব উন্নত অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হ'য়েছিলো, নেপোলিয়ান তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন এবং তা তাঁর সেনাবাহিনীকে অপরাজেয় করতে সহায়ক হ'য়েছিল। অন্যদিকে নেপোলিয়ান সৈনিক হিসাবে যাদের পেয়েছিলেন, তারাও যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্খী, যোগ্য ও দক্ষ ছিল। বয়সে নবীন এই সব সৈনিকদের মধ্যে প্রাণশক্তি ও উদ্যম ছিল লাগাম ছাড়া। বিপ্লবী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করায় এক ধরণের আর্দশবোধ তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। নতুন যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যেও শৃঙ্খলাবোধ ও আদর্শের অভাব ছিল না। মনে রাখা দরকার নেপোলিয়ান সব সময়েই গুণ ও যোগ্যতার কদর করতেন। নেপোলিয়ানের সাফল্যের আর একটি কারণ হলো তাঁর উন্নত রণ কৌশল। অষ্টাদশ শতকের শেষপর্বে সমর বিজ্ঞানে যে চমকপ্রদ উন্নতি ঘটেছিল ও কলা কৌশলের প্রচলন হ'য়েছিল, সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ানই প্রথম তা গ্রহণ করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপের দেশগুলি নেপোলিয়ানের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। তবু কেবলমাত্র নেপোলিয়ানের প্রতিভা বা তাঁর সেনাবাহিনীর যোগ্যতাই এই চমকপ্রদ সাফল্যে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হতে পারে না। ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার মিলিত শক্তিকে কখনই উপেক্ষা করা যেতে পারে না। নেপোলিয়ানের অসাধারণত্ব স্বীকার করেও তাঁকে অলৌকিক ও ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আসলে নেপোলিয়ানের সাফল্যের আর একটি প্রধান কারণ হলো তৃতীয় শক্তিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনৈক্য ও সুষ্ঠু বোঝাপড়ার অভাব। সুচতুর নেপোলিয়ান তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর নীতি ছিল সবাইকে এক সঙ্গে আক্রমণ না করে, প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে মোকাবিলা করা। সদস্য রাষ্ট্রগুলি যেমন প্রত্যেকে নেপোলিয়ানকে তাদের শত্রু বলে মনে করতো, তেমনি তাদের নিজেদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস ছিল। সেই কারণে তারা যেমন নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে ছিল, তেমনই প্রয়োজনে ও স্বার্থের খাতিরে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতেও অরাজী ছিল না। তারা নিজেরাও সাধু পুরুষ ছিল না। তারাও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনে আগ্রহী ছিল। তফাৎ এইখানে যে, তাদের লক্ষ্য ও উচ্চাকাঙ্খা ছিল আঞ্চলিক, আর নেপোলিয়ানের দৃষ্টি ছিল সারা ইউরোপ জুড়ে। তারা ব্যর্থ হয়েছিল আর নেপোলিয়ান সফল হ'য়েছিলেন, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য। সমকালীন ইউরোপের কূটনীতি ও পররাজ্যগ্রাসী মনোবৃত্তির মধ্যে বৈপ্লবিক কিছু



না। দ্বিতীয় ফ্রেডারিক বা দ্বিতীয় ক্যাথারিণের তুলনায় নেপোলিয়ান অনেক বেশী উচ্চাকাঙ্খী ও পররাজ্যলোভী ছিলেন। তাঁরা সীমিত পরিসরে ইউরোপে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন। আর নেপোলিয়ান গোটা ইউরোপ কাঁপিয়েছিলেন। তবে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

## নেপোলীয় সাম্রাজ্য ও ইউরোপের পুনর্গঠন

নেপোলিয়ানের চকিত অভ্যুত্থান ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। যে ভাবে অবলীলাক্রমে তিনি ইউরোপের শক্তিশালী রাজ্যগুলিকে একের পর এক পরাজিত করেছিলেন, তা যে কোন রোমাঞ্চকর কাহিনীর মতই আকর্ষণীয়। তিনি যথেচ্ছভাবে ইউরোপের মানচিত্র পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন দেশের রাজা বা রাষ্ট্র প্রধানদের ক্ষমতাচ্যুত ও সিংহাসনচ্যুত করে ইউরোপকে পুনর্গঠিত করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর সামরিক সাফল্য ও বিজয়ের ফলে এক নতুন ইউরোপের জন্ম হয়। নবগঠিত এই ইউরোপের ভিত্তি ছিল তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য।

ইউরোপের যে দুটি অঞ্চলে নেপোলিয়ানের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হ'য়েছিল এবং একপ্রকার আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তা হ'লো ইটালী ও জার্মানী। দুটি দেশই তখন জাতীয় ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। অসংখ্য ছোট বড় রাষ্ট্রে তখন ইটালী ও জার্মানী বিভক্ত ছিল। দুটি দেশের উপরই অষ্ট্রিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ বংশীয় রাজারা একই সঙ্গে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মুকুট পরতেন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। মধ্যযুগের প্রাচীন ঐতিহ্যটুকু ছাড়া এর আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সেই ঐতিহ্যের স্মৃতিও ক্রমশঃ ধূসর ও ঝাপসা হ'য়ে এসেছিল। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাই ভলতেয়ার বলেছিলেন যে, তা না ছিল পবিত্র, না ছিল রোমান এবং না ছিল কোন সাম্রাজ্য। নেপোলিয়ান এই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে এবং তার মৃত্যুকালীন পরোয়ানা জারী করে অতীতের সঙ্গে তার ক্ষীণ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে দেন। হ্যাপস্‌বার্গ রাজ পরিবারের পক্ষে এই সম্মান হানি অবশ্যই অপমানজনক ছিল। কিন্তু এর ফলে বড় কিছু ক্ষতি হয় নি। যাই হোক বারংবার অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে ইটালীতে ব্যাপক ভোগৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। এর সূচনা হ'য়েছিল ডিরেকটরির রাজত্বকালে। ঐ সময় সিজালপাইন (Cisalpine) প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হ'য়েছিল এবং পিডমন্ট ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল। ক্যাম্পোফোর্মিও ও প্রেসবার্গের চুক্তির ফলে নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়ার অধীন ইটালী দখল করে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করেন এবং নিজে ইটালীর রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। টাসকানি, পিডমন্ট ও জেনোয়া ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। পরে পোপকে বন্দী করে রোমকেও সরাসরি ফ্রান্সের শাসনাধীনে আনা হয়। দক্ষিণ ইটালীর নেপেলস থেকে বুর্বো রাজবংশের একটি শাখার রাজপুরুষ দ্বিতীয় ফার্দিনান্দকে বিতাড়িত করা হয়।

জার্মানীতে পুনর্গঠনের কাজ ছিল আরও চমকপ্রদ। জার্মানীর পুনর্গঠনের ফলে সেখানকার ভৌগোলিক জটিলতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল। অষ্ট্রিয়ার শক্তি দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তিনি ব্যাভেরিয়া (Bavaria) ও নিকটবর্তী কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে একটি রাজতান্ত্রিক দেশ গঠন করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাভেরিয়াও

Scanned with CamScanner

যাতে অধিকতর শক্তিশালী হ'য়ে উঠতে না পারে, তার জন্য তিনি উর্টেনবার্গ নামে আর একটি রাজ্য গঠন করেন। দক্ষিণ জার্মানীতে গঠন করা হলো ব্যাডেন নামে আরও একটি রাজ্য। তবে জার্মানীতে নেপোলিয়ানের সবচেয়ে উল্লেখ্য কীর্তি হলো রাইন কনফিডারেশন গঠন। এর উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীতে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েরই শক্তি খর্ব করা। ব্যাভেরিয়া, উর্টেনবার্গ, স্যাক্সনি সহ আরও বেশ কয়েকটি জার্মান রাষ্ট্র এর সদস্য ছিল। এ ছাড়া হ্যানোভার, ব্রান্সউইক, হেসেকেসেল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যাংশ নিয়ে ওয়েষ্টফেলিয়া রাজ্য গঠন করা হলো। অন্যদিকে প্রাশিয়া ও রাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে তিনি গঠন করলেন আর একটি রাজ্য, যার নাম গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস। এর দায়িত্ব দেয়া হলো স্যাক্সনীকে। জার্মানীর পুনর্গঠনের ফলে মোট জার্মান রাষ্ট্রের সংখ্যা প্রায় ৩০০টি থেকে নেমে দাড়ায় ৩৯টি।

ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলে যে সব পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাটাভীয় প্রজাতন্ত্র। পরে এটি হল্যাণ্ড রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সুইজ্যারল্যাণ্ডে হেলভেটিক প্রজাতন্ত্রের স্থানে গঠিত হয় সুইস্ কনফিডারেশন।

যে সব অঞ্চল নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছিল বা যে সব নতুন রাজ্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর নীতি ছিল সেখানকার শাসকদের উৎখাত করে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা কোন অনুচরকে সেই সব রাষ্ট্রের কর্ণধার করা। এই নীতি অনুসরণ করেই তিনি হল্যাণ্ডে তাঁর ভাই লুইকে, ওয়েষ্টফেলিয়ায় আর এক ভাই জেরোমকে, ইটালীর লোম্বার্ডিতে নিজ সৎপুত্র ইউজিনকে, নেপেল্‌সে প্রথমে আর এক ভাই জোসেফকে ও পরে আর এক আত্মীয় মুরাটকে শাসক নিযুক্ত করেন। পরে যখন তিনি স্পেন অধিকার করেন, তখন জোসেফকে স্পেনের রাজা করা হয়। নেপোলিয়ান নিজেকে ইটালীর রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

## নেপোলীয় সাম্রাজ্যের স্বরূপ ও তাৎপর্য

কালের বিচারে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হ'য়েছিল। সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই পতনের সূচনা হ'য়েছিল। ১৮১৫ সালে তাঁর সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কালের বিচারে বিশ্লেষণ করা অযৌক্তিক। সেন্ট হেলেনায় বন্দী জীবন যাপন করার সময় নেপোলিয়ান বলেছিলেন যে, তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্য ছিল ইউরোপীয় জনগণের জাতীয় আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করা। এই ধরণের কোন সৎ উদ্দেশ্য তাঁর ছিল বলে মনে হয় না। নিজের স্বার্থে অবশ্য তিনি অনেক সময় ইউরোপের মানুষের অনুভূতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। ইটালী ও পোল্যাণ্ডের জনগণের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছিল। কিন্তু পরে প্রমাণিত হ'য়েছিল যে, ইউরোপের জনগণের স্বার্থে নয়, নিজের প্রয়োজনেই তিনি এই ধরণের ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন। আসলে তাঁর শাসন ছিল অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতীক। প্রথম দিকে না হলেও পরের দিকে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ নগ্নরূপে উন্মোচিত হ'য়েছিল। যাই হোক তিনি চান বা না চান, তাঁর



শাসন ইউরোপে এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের গভীরতর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডেভিড টমশন মন্তব্য করেছেন— "Europe could never be the same again, however earnest and extensive the attempts at restoration after his fall." বস্তুতঃ যেখানেই নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল, সেখানেই পুরাতনতন্ত্রের পতন হ'য়েছিল। ইউরোপের প্রায় সর্বত্র সামন্ত প্রথা ছিল প্রধান অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা। এর ভিত্তি ছিল আইনের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে সামন্ততন্ত্রের পতন হয়, চার্চের প্রাধান্য লুপ্ত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও কৃষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। করব্যবস্থা আরও সুষম ও দক্ষ করা হয়। অভ্যন্তরীন শুল্ক বাধা অপসৃত হয়। শহরের গিল্ডগুলির বিশেষ সুবিধা তুলে দেয়া হয়। সর্বত্র প্রতিভা ও যোগ্যতার দাম দেয়া হয়। সারা ইউরোপ জুড়ে এক মুক্তির হাওয়া বইতে থাকে। ইউরোপ আধুনিকতার স্পর্শ পায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে ইউরোপে সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দেয়া হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, কোড নেপোলিয়ানে বৈপ্লবিক মতাদর্শ ও রোমান আইনের এমন অপূর্ব সমন্বয় হ'য়েছিল যে, সারা ইউরোপের মানুষের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হ'য়েছিল। এক কথায় আমরা বলতে পারি ফরাসী বিপ্লব যা করতে পারে নি, নেপোলিয়ান তাই করেছিলেন। নেপোলিয়ান বিপ্লবের বাণী ইউরোপে ছড়িয়ে দিয়ে ফরাসী বিপ্লবকে ইউরোপীয় বিপ্লবে রূপান্তরিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রতীক। সুতরাং নেপোলীয় সাম্রাজ্যের অর্থ ছিল ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ। এই কারণে যেখানেই নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনী প্রবেশ করেছিল, ইউরোপের মানুষ তাদের স্বাগত জানিয়েছিল মুক্তিদাতা হিসাবে। তারা বীরোচিত সম্বর্ধনা পেয়েছিল। মনে রাখা দরকার প্রাক্‌বিপ্লব যুগে ফ্রান্সের সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বড় ধরণের কোন পার্থক্য ছিল না। যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ফরাসী বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, ইউরোপে তা অটুট ছিল। নেপোলিয়ানই বাইরে থেকে তাকে আঘাত করে ধ্বংস করেন। ডেভিড টমশন বলেছেন— "Its (Napoleon's empire) most destructive achievements were among its most permanent." নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপের মানুষকে তিনি যে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন, তা তারা কোনদিন ভোলে নি। এই অবস্থায় পুরানো দিনে ফিরে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল। হতে পারে নেপোলিয়ান নিজের স্বার্থে অর্থাৎ ইউরোপের মানুষের কাছে তাঁর স্বৈরতন্ত্রী শাসন গ্রহণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য এই সব সংস্কারে ব্রতী হ'য়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, এর ফলে যে ইউরোপের মানুষের তন্দ্রা ভেঙ্গেছিল এবং তারা যে বিপ্লবমনস্ক হ'য়েছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। তাই ইউরোপীয় রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টিতে ফরাসী বিপ্লব নয়, নেপোলিয়ানই ছিলেন অধিকতর বিপজ্জনক।

নেপোলিয়ান ইউরোপের মুক্তির অগ্রদূত ছিলেন। ইউরোপের মানুষ তাঁকে মুক্তিদাতা হিসাবে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি তিনি ইউরোপের মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন? মনে রাখা দরকার একনায়কতন্ত্র ও স্বাধীনতার সহাবস্থান কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। ক্রমশঃ নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের তাৎপর্য ইউরোপের মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হ'য়েছিল। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি যা কিছু করছেন, তার উদ্দেশ্য হলো ফ্রান্সের মানুষের ভাল করা। কিন্তু একই সঙ্গে ফ্রান্সের মানুষ

Scanned with CamScanner

ও ইউরোপের মানুষের ভাল করা সম্ভব নয়। তিনি যখন ফ্রান্সের ভাল করার জন্য ইউরোপে শোষণ নীতি অনুসরণ করতে শুরু করলেন, তখনই তাঁর স্বরূপ নগ্নভাবে উন্মোচিত হ'য়ে গেল। ইউরোপে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেল। তাঁর মুক্তিদাতার ভাবমূর্তি খসে পড়লো। ফ্রান্সের মানুষকে তিনি স্বাধীনতা দেন নি। ইউরোপের মানুষকে তা দেবেন এমন আশা করা উচিত নয়। নেপোলিয়ান তাঁর ভাই জেরোমকে উপদেশ দিয়েছিলেন— "If you listen to popular opinion, you will achieve nothing." সুতরাং নেপোলিয়ানের শাসনের কিছু প্রজাকল্যাণকর দিক থাকলেও ইউরোপের মানুষ তাঁর উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁর শাসনে গণতন্ত্রের কোন স্থান ছিল না। জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও স্বীকৃত হয় নি।

অজ্ঞাতসারে এবং নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেপোলিয়ান আর একটি আধুনিক ও বৈপ্লবিক মতবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই মতবাদ হলো জাতীয়তাবাদ। ইটালী, জার্মানী ও অংশতঃ পোল্যাণ্ডে তিনি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। ইটালী ও জার্মানী দুটি দেশেই জাতীয়তাবোধের আদর্শ অনেকাংশে অজ্ঞাত ছিল। নেপোলিয়ান ইটালীতে সিজালপাইন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেখানকার মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিলেন। ১৮০২ সালে যখন এই প্রজাতন্ত্রের নতুন নামকরণ হয় ইটালী প্রজাতন্ত্র, তখন তা সাধারণ মানুষকে আবার নতুন করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল। পরে অবশ্য নেপোলিয়ান নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করায় ও ইটালীর উপর তাঁর সাম্রাজ্যবাদী শাসন চাপিয়ে দেওয়ায়, তাঁর এই মুক্তিদাতা ভাবমূর্তি কিছুটা মলিন হ'য়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নেপোলিয়ানের শাসনের ফলে ইটালীর মানুষের মধ্যে যে নতুন চেতনা ও ঐক্যবোধ জাগ্রত হ'য়েছিল, তা তারা ভোলে নি। ১৮১৫ সালে ভিয়েনা মহাসম্মেলনে তাদের এই নবজাগ্রত চেতনা অগ্রাহ্য করা হলেও যে বীজ নেপোলিয়ান বপন করেছিলেন, পরে তা ইটালীর জাতীয় আন্দোলনের পাথেয় হ'য়েছিল। জার্মানীর ক্ষেত্রেও একই ধরণের ঘটনা ঘটেছিল। এখানে তিনি অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েরই ক্ষমতা খর্ব করে এবং জার্মানীর ভৌগোলিক জটিলতা হ্রাস করে ঐক্যের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতা বিলোপ করে এবং প্রগতিশীল প্রশাসনিক সংস্কার চালু করে ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেপোলিয়ান জার্মান উদারনীতিবাদেরও জন্ম দিয়েছিলেন। জার্মানীতে নেপোলিয়ানের অবদান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এ. জে. পি. টেলর মন্তব্য করেছেন— "Napoleon is often accused of having enslaved the Germans.... He did for the German liberals what they were never afterwards able to do for themselves." ইটালীর জনগণের মত জার্মানীর জনগণও তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ ও উদারনীতিবাদের যে আদর্শে দীক্ষিত হ'য়েছিল, তা তারা কোনদিন ভোলে নি। পরে তাঁর অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জার্মানীতে যে মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত হ'য়েছিল, তা জার্মান জাতীয়তাবাদকে আরও শক্তিশালী করেছিল। পোল্যাণ্ডের জনগণের কাছেও নেপোলিয়ান রাশিয়া ও প্রাশিয়ার অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিদাতা হিসাবে প্রতিভাত হ'য়েছিলেন। তাঁর মধ্যে পোল্যাণ্ডের মানুষ তাদের জাতীয়তাবোধের সাফল্যের স্বপ্ন দেখেছিল। গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস গঠন ছিল পোল জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির প্রতীক। সাক্সনীর রাজার অধীনে অল্পকালের জন্য শাসিত হলেও এখানে ফরাসী সরকারের আদলে একটি দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হ'য়েছিল। চার্চের উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। আইনের চোখে সবাইকে সমান বলে ঘোষণা করে একটি উদারনৈতিক



সংবিধানও চালু করা হ'য়েছিল। সার্ফ প্রথার অবসান হ'য়েছিল। কিন্তু কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি। এ সব সত্ত্বেও কিন্তু পোল্যাণ্ড ব্যবচ্ছেদের কোন প্রতিকার করা সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে আর নেপোলিয়ানের উপর অসন্তুষ্ট হ'য়েছিলেন। তবু পোল্যাণ্ডের মানুষ যে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল, তার জন্য তারা নেপোলিয়ানের কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। তবে পোল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেও তিনি যা কিছু করেছিলেন, তা তাঁর স্বার্থের খাতিরেই করেছিলেন, এবং পোল্যাণ্ডের মানুষ তাঁর নীতিতে হতাশ হ'য়েছিল। টিলজিটে তিনি এক প্রকার পোল্যাণ্ডের উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

সামগ্রিক বিশ্লেষণে আমরা বলতে পারি নেপোলিয়ান ছিলেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ "জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী।" দ্বিতীয় ফ্রেডারিক, দ্বিতীয় জোসেফ বা দ্বিতীয় ক্যাথারিন নিজ নিজ দেশে স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখে কিছু প্রগতিশীল ও জনকল্যাণকর সংস্কারের মাধ্যমে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ানও অনেকটা তাই করেছেন। কিন্তু দু-দিক থেকে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী তফাৎ ছিল। প্রথমতঃ যা কিছু তিনি করেছেন, তা শুধু ফ্রান্সের জন্যই করেন নি; যেখানে যেখানে তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই তিনি তাঁর সংস্কারগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে পুরাতনতন্ত্রের জীর্ণ কাঠামো ও বাতিল হ'য়ে যাওয়া ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে এক নতুন ইউরোপ গড়বেন, এক নতুন ঐক্যের বন্ধনে ইউরোপের মানুষকে আবদ্ধ করবেন। তবে সেই ঐক্যের প্রতীক হবেন স্বয়ং তিনি। প্রত্যেককে তাঁর ক্ষমতার কাছে অবনত হতে হবে। এখানে তিনি চতুর্দশ লুই-এর সহযাত্রী। চতুর্দশ লুই-এর মত তিনিও বলতে পারতেন— "রাষ্ট্র কি? আমিই রাষ্ট্র।" দ্বিতীয় যে দিক থেকে তিনি অন্যান্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী থেকে এগিয়ে, তা হ'লো তাঁর সাম্যের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য। তিনি তাঁর ভাই জেরোমকে বলেছিলেন— "In Germany, as in France, Italy and spain, people long for equality and liberation." তিনি প্রতিভার কদর করতেন, কারণ তাঁর নিজের ক্ষমতার উৎস ছিল প্রতিভা। অন্য কোন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী যোগ্যতা বা প্রতিভার এত দাম দেন নি। কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে তিনি সাম্যের আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ফেলিক্স মারখ্যামের ভাষায়— "The code was the container in which the principles of the French Revolution were carried throughout Europe, even as far as Illyria and Poland." তবে জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারের দিন যে ফুরিয়ে আসছে নেপোলিয়ানের নিজের কার্যাবলীর মধ্যেই তাঁর ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। বিপ্লবের শিক্ষা যে নিষ্ফল হবে না, তা যে ক্রমশঃ স্বৈরতন্ত্রের অন্তিমলগ্ন সমাসন্ন করবেন, নেপোলিয়ান নিজেই পরোক্ষভাবে এবং অজ্ঞাতসারে তার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। নিজের সর্বনাশের বীজ তিনি নিজেই বপন করেছিলেন।

## সূত্রনির্দেশ

১. Rude, G. —Revolutionary Europe, পৃঃ ২৪২
২./৩. Thomson David— Europe since Napoleon, পৃঃ ৬৭
৪. Taylor, A. J. P.— Course of German History পৃঃ ৩০
৫. Markham, F. —Napoleon and the Awakening of Europe পৃঃ ১২৩



Scanned with CamScanner

# ৫ নেপোলিয়ান ঃ পতন পর্ব (১৮০৬-১৮১৫)

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই তাঁর পতন সূচিত হ'য়েছিল। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে। আমরা তাঁর পতনকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি— ১. তাঁর পতনের মৌলিক বা সাধারণ কারণ ও ২. তাঁর ভুলভ্রান্তি, যার মধ্যে তিনটি ভুলের কথা—স্পেনীয় ক্ষত, পোপের প্রতি অসম্মানসূচক আচরণ ও মস্কো অভিযান—নেপোলিয়ান নিজে স্বীকার করে গেছেন।

## নেপোলিয়ানের পতনের মৌলিক কারণ

সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খা যে নেপোলিয়ানের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল, সে কথা স্বীকার্য। সমগ্র ইউরোপের উপর তাঁর বা ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যে অলীক একটি স্বপ্ন, তা তাঁর মত একজন বিচক্ষণ, দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ কেন বুঝতে পারেন নি, তা সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সমগ্র ইউরোপকে এক আইন ও শাসনের বন্ধনে আবদ্ধ করা অথবা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য বা শার্লামেনের সাম্রাজ্যের অনুকরণে এক অখণ্ড ইউরোপীয় ঐক্য গড়ে তোলা ও একটি সর্বাত্মক বা সার্বিক সাম্রাজ্য স্থাপন করার প্রয়াসের মধ্যে এক ধরণের আদর্শবাদ থাকতে পারে; কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ায় এই ধরণের সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা অবাস্তব ও হাস্যকর ছিল। বস্তুতঃ নেপোলিয়ান ফ্রান্সে তাঁর উত্থান পর্বে যতটা বাস্তব বোধ ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তা দিতে পারেন নি। নেপোলিয়ানকে বিপ্লবের সন্তান বলে অভিহিত করা হলেও সাম্রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি ছিল অতীতমুখী এবং আলেকজান্দার ও জুলিয়াস সীজারের আদর্শ ও তাঁদের বিশ্ব বিজয়ের প্রচেষ্টা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর সীমাহীন উচ্চাকাঙ্খার মধ্যে নেপোলিয়ানের পতনের কারণ অনুসন্ধান করা অযৌক্তিক। তাঁর পতনের গভীরতর মৌলিক কিছু কারণ ছিল। নেপোলিয়ানের পতন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডেভিড টমশন বলেছেন, যে পদ্ধতিতে তাঁর সাম্রাজ্য গঠিত হ'য়েছিল, তাই শেষপর্যন্ত তাঁর পতন ডেকে এনেছিল। অর্থাৎ তাঁর সাফল্য যে পথে এসেছিল, পতনও সেই পথ ধরেই এসেছিল। ডেভিড টমশনের ভাষায়— "The methods by which the empire was created were one of the main reasons for its defeat." নেপোলিয়ান নিজে স্বীকার করেছেন যে ধারাবাহিক সাফল্য ও ভীতি প্রদর্শনই ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি। তাঁর ভাষায়—'Conquest has made me what I am and Conquest can alone maintain me..... Abroad and at home I reign only through the fear I inspire." তিনি তাঁর ভাই লুইকে যখন হল্যাণ্ডের রাজা করেন,



তখন তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন— "The prince who, in the first year of his reign is considered to be kind, is a prince who is mocked at in his second year." কিন্তু সমগ্র বা সার্বিক বিজয়ের সাম্রাজ্যবাদিতার পথে বাধা যেমন নেপোলিয়ানের মত বিজয়ী বীরের পক্ষেও অসম্ভব ছিল, তেমনই ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চিরদিন কারও আধিপত্য বজায় রাখা ছিল আকাশকুসুম এক কল্পনা। নেপোলিয়ান নিজেও এ কথাও বুঝতেন। তিনি এক সময় বলেছিলেন—"Brute force has never attained anything durable." অর্থাৎ কেবলমাত্র পাশবিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে কখনই কোন কিছু দীর্ঘদিন ধরে রাখা যায় না। ফ্রান্স এবং ইউরোপের জনগণের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি বেশ কিছু জনকল্যাণকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে তাঁর এই শুভবুদ্ধির বিলোপ ঘটেছিল। তাঁর শাসন ক্রমশঃ নীতিহীন অত্যাচারে পরিণত হ'য়েছিল। জন সমর্থন ছাড়া কোন শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। নেপোলিয়ানের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠন তথা সাফল্যের একটি বড় কারণ অবশ্যই তাঁর সামরিক শক্তি। তাঁর ভীতি প্রদর্শন নীতির ভিত্তিই ছিল সামরিক শক্তি। তাঁর রণকৌশলের সঙ্গে ইউরোপের রাজ্যগুলি (ইংল্যাণ্ড ছাড়া) সামাল দিতে পারে নি। তবু উন্নত রণকৌশলই তাঁর সামরিক সাফল্যের একমাত্র কারণ ছিল না। তিনি যে দ্রুতগতিতে তাঁর বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তৃতীয় শক্তিজোট ভেঙে দিয়েছিলেন, তার জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনৈক্য ও বোঝাপড়ার অভাব। কিন্তু যখন তাঁর রণকৌশলের রহস্য আর ইউরোপীয় শক্তিগুলির কাছে অজ্ঞাত রইলো না, তখন তাঁরই বিরুদ্ধে সেই রণকৌশলের প্রয়োগ নেপোলিয়ানের অপরাজেয় আখ্যা ম্লান করে দিল। নেপোলিয়ান নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার রণকৌশল বাতিল হ'য়ে গিয়েছিল। সেন্ট হেলেনায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন— "I have fought sixty battles and I have learned nothing which I did not know in the beginning." অন্যদিকে তাঁর প্রতিপক্ষরা এই দিক থেকে অনেকটা উন্নতি করেছিল। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সাফল্য যেমন প্রতিপক্ষকে দিল আত্মবিশ্বাস, তেমনই তাঁর সম্পর্কে ভীতিরও অবসান হলো। অন্যদিকে ইউরোপীয় শক্তিগুলি যখন অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলো যে, তাদের কারও একক প্রচেষ্টায় নেপোলিয়ানকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না, তখন তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। সম্মিলিত এই আক্রমণ প্রতিহত করা নেপোলিয়নের মত বড় বীরের পক্ষে ও সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়ান ভীতিই ইউরোপীয় রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে ভীতি ছিল নেপোলীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি, তাই শেষপর্যন্ত তাঁর পতনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

নেপোলিয়ানের পতনের আর একটি প্রধান কারণ হলো তাঁর সাম্রাজ্য গঠনের আত্মঘাতী স্ববিরোধিতা। অর্থাৎ তাঁর বিঘোষিত নীতি ও বাস্তব কার্যকলাপের মধ্যে আসমান জমিন পার্থক্য ছিল। নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য গঠনের অর্থ ছিল ইউরোপে বিপ্লবের প্রসার। যেখানেই তাঁর সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, সেখানেই ইউরোপে পুরাতনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটেছিল। ইউরোপের মানুষ তাই প্রথমে তাঁকে মুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দিত করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ

নেপোলিয়ানের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হতে থাকে। ইউরোপের মানুষ বুঝতে পারে যে, নেপোলিয়ান তাঁর দেশের স্বার্থে এবং নিজ পরিবারের উন্নতির জন্য ইউরোপকে ব্যবহার করেছেন। নেপোলিয়ান নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, "My policy is France before all." কিন্তু ফ্রান্সের স্বার্থ ও ইউরোপের স্বার্থ কখনই এক হতে পারে না। নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা এই বাস্তব সত্যকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। ইউরোপের যেখানেই নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, সেখানেই তিনি সিংহাসন দখল করে নিজ ভাই বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনকে সেখানে বসিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়স্বজনরা ছিল অপদার্থ ও অযোগ্য। তাঁদের শাসন পূর্বতন রাজাদের শাসনের তুলনায় কোন অংশে কম অত্যাচারী ছিল না। এই অবস্থায় নেপোলিয়ান তাঁর জনপ্রিয়তা হারাতে থাকেন। নেপোলিয়ানের মুক্তিদাতা ভাবমূর্তি মলিন হ'য়ে ক্রমশঃ তাঁর একনায়কতন্ত্রী ও অত্যাচারী চরিত্র স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। নেপোলিয়ানের কার্যকলাপ ইউরোপের মানুষের মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনার সঞ্চার করেছিল, তাই তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর পতন ডেকে এনেছিল।

নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের স্ববিরোধিতার আর একটি উদাহরণ হলো জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সংঘাত। নেপোলিয়ান ইটালী, জার্মানী, স্পেন প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার মানুষের মধ্যে সুপ্ত জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদের এই বিকাশ নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু ইটালী ও জার্মানীতে অষ্ট্রিয়ার শক্তি খর্ব করে ও প্রাশিয়াকে পরাজিত করে এবং উভয় দেশের ভৌগোলিক জটিলতা সরল করে তিনি কৃত্রিমভাবে তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন। তাছাড়া একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে ও কোড নেপোলিয়ানের মাধ্যমে বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচার করে তিনি এই সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এক তীব্র আবেগ ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের এই প্রসার তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। যখন তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে এই সব অঞ্চলের মানুষের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সংঘাত বাঁধলো, তখন তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠলো। নেপোলিয়ানের পতনে জার্মানীর মুক্তিযুদ্ধের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ক্ষমতার আরোহণের সময় নেপোলিয়ান যে দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরের দিকে তিনি তা বজায় রাখতে পারেন নি। একের পর এক ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেন নি। এই চারিত্রিক অবনতিও তার পতনের জন্য দায়ী ছিল। অবশ্য চরম বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্যেও যে সময় সময় মাথা তুলে তিনি দাঁড়াতে পেরেছিলেন, সে কথাও সত্য। এলবা (Elba) দ্বীপে নির্বাসনের পরও তিনি হতোদ্যম হন নি এবং সেখান থেকে পালিয়ে এসে নতুন করে ভাগ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে শেষরক্ষা হয় নি। অসাধারণ হলেও নেপোলিয়ান রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন এবং সাধারণ মানুষের দোষগুণ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুব উঁচু ছিল না। তিনি তাদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন। সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনকালে তিনি মন্তব্য করেছিলেন— "Men must be very bad to be as bad as I think they are." তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুচরদেরও সব সময় বিশ্বাস করতেন না এবং একজনকে অপর জনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তাদের মধ্যে হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব গড়ে তুলতেন। যত তাঁর ক্ষমতা বেড়েছে, ততই তিনি উদ্ধত হ'য়ে উঠেছিলেন এবং অনুচরদের কাছ থেকে অখণ্ড আনুগত্য দাবী করতেন। তাঁদের সৎ পরামর্শও সন্দেহের চোখে দেখতেন। ফলে চ্যাপটাল (Chaptal), টেলিরাণ্ড (Talleyrand), ফুশে (Fouche) প্রভৃতি স্বাধীন মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে। এঁদের সরিয়ে দিয়ে তিনি এমন সমস্ত ব্যক্তিকে তাঁর সহকর্মী হিসাবে বেছে নেন, যাঁদের একমাত্র গুণ ছিল তাঁর স্তাবকতা করা। চ্যাপটাল দুঃখ করে বলেছিলেন— "He (Napoleon) wanted valets, not counsellors". ১৮০৬ সালেই তাঁর জনৈক মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন— "The Emperor is mad, and will destory us all." এমন কি মেটারনিকও সম্রাটের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে ১৮০৭ সালে বলেছিলেন— "There has recently been a total change in the methods of Napoleon: he seems to think that he has reached a point, where moderation is a useless obstacle." বস্তুতঃ একের পর এক ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে তিনি ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছিলেন। মস্কো অভিযানের পর তিনি যখন দেশে ফিরে এসেছিলেন, তখন তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে চ্যাপটাল (Chaptal) মন্তব্য করেছিলেন— "After his (Napoleon) return from Moscow those who saw most of him noticed a great change in his physical and mental contitution." মানসিক দিক থেকে এইভাবে ভেঙ্গে পড়ায় তিনি পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে পারেন নি।



নেপোলিয়ানের মানসিক দুর্বলতার আর একটি কারণ হলো তাঁর নিকট আত্মীয়দের অকৃতজ্ঞ আচরণ। তিনি তাঁর ভাই জোসেফকে প্রথমে নেপলস্ ও পরে স্পেনের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। আর এক ভাই লুইকে করেছিলেন হল্যাণ্ডের রাজা। অন্য আর এক ভাই জেরোম ছিলেন ওয়েষ্টফেলিয়ার রাজা। কিন্তু এঁদের কারও কোন যোগ্যতা ছিল না। এঁদের নিয়ে নেপোলিয়ানের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কিন্তু এঁদের অকৃতজ্ঞ আচরণ তাঁকে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ করেছিল। ১৮১৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন— "I have sacrificed hundreds of thousands of men to make Joseph reign in Spain. It is one of my mistakes to think my brother necessary to assure my dynasty." অন্য আর এক প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— "From the way they talk, one would think that I had wasted our parents' estate." নেপোলিয়ানের চারিত্রিক অবনতি ও মানসিক বিপর্যয় তাঁর দৈহিক শক্তির বা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ত করে নি, কিন্তু মনোবল হারিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলেন।

নেপোলিয়ানের আর একটি ব্যর্থতা হলো তাঁর অতিরিক্ত আত্মনির্ভরশীলতা। আত্মনির্ভরশীলতা নিঃসন্দেহে একটি বড় গুণ। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মনির্ভরশীলতা রাজনীতির ক্ষেত্রে সব সময় শুভ হয় না। নেপোলিয়ান কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী গড়ে তুলতে চান নি। ফলে অনেক সময় তাঁর অনুচরগণ তাঁর পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে পারেন নি। তারপর বিপর্যয় যখন আসতে শুরু করলো,

Scanned with CamScanner

তাঁর মানসিক শক্তি যখন ক্ষয় পেতে থাকলো, তখন তা থেকে উদ্ধার পাবার কোন পথই খোলা রইলো না।

## নেপোলিয়ানের ভুল

নেপোলিয়ান নিজে যে তিনটি মারাত্মক ভুলের কথা স্বীকার করেছেন, সে কথা আমরা আগে বলেছি। কিন্তু দম্ভ বা অহমিকা, যে কোন কারণেই হোক না কেন, তিনি তাঁর সবচেয়ে বড় ভুলের কথা স্বীকার করেন নি। সেই ভুলটি হলো 'মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা' ঘোষণা। নেপোলিয়ানের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন দিনই সুবিধা করে উঠতে পারেন নি। ইংল্যাণ্ড ছিল তাঁর চিরশত্রু। কিন্তু মিশর অভিযান থেকে শুরু করে ট্রাফালগারের যুদ্ধ (১৮০৫) পর্যন্ত নেপোলিয়ান বার বার ইংল্যাণ্ডের হাতে বিপর্যস্ত হ'য়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে তাঁর সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই ইংল্যাণ্ডকে কাবু করার জন্য তিনি পরোক্ষ যে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, তাই হলো মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা।

## মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা

দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে নেপোলিয়ান তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ করা। সরাসরি নৌ-যুদ্ধে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করা অসম্ভব বিবেচনা করে নেপোলিয়ান চেয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতিকে এমনভাবে পঙ্গু করতে, যাতে সে শেষপর্যন্ত তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তিনি জানতেন ইংল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির মূল উৎস তার জগৎজোড়া বাণিজ্য। ইংরেজদের তিনি 'দোকানদারের জাত' বলে অভিহিত করতেন। কাজেই যদি তার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দেয়া যায়, তাহ'লে ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ হবে। এই ছিল নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় ব্যবস্থার মূল কথা। নিছক তাত্ত্বিক বিচারে নেপোলিয়ানের এই নীতি অভ্রান্ত ছিল এবং যথাযথভাবে তা প্রয়োগ করতে পারলে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এই সংকট কাটিয়ে ওঠা খুবই দুরুহ ছিল। ইংল্যাণ্ড ইউরোপে যে সব দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করতো, তার একটা বড় অংশ আসতো তার উপনিবেশ থেকে; আর একটি অংশ আসতো নিজের দেশ থেকে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব হওয়ায় সেখানকার তৈরী উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রীর একটা বড় বাজার ছিল ইউরোপে। কিন্তু ইউরোপের বাজারে যদি ইংলণ্ডের রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য সামগ্রী প্রবেশ করতে দেয়া না হয়, তাহ'লে ইংল্যাণ্ডের বণিক শ্রেণী ও উঠতি শিল্পপতি উভয়েই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপনিবেশ থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্র ও ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী উভয়েই অবিক্রীত হ'য়ে থাকবে। কিন্তু শুধু ব্যবসাই নয়, ইংল্যাণ্ডের শিল্পোদ্যোগও বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। চাহিদার অভাবে ইংল্যাণ্ডের কল কারখানাগুলি অচল হ'য়ে পড়বে। উৎপাদন বন্ধ হলে শ্রমিক ছাঁটাইও অনিবার্য হ'য়ে পড়বে। এর ফলে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দেবে। এক কথায় ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়বে। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড তার খাদ্যের জন্য অনেকটাই



ইউরোপের উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যদি ইউরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায়, তাহ'লে ইংল্যাণ্ডে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেবে। খাদ্যাভাব যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং তাঁর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া যে কতটা মারাত্মক হতে পারে, ফরাসী বিপ্লব নেপোলিয়ানকে সে শিক্ষা দিয়েছিল। তিনি বলতেন— "I fear insurrections caused by shortage of bread. I would fear them more than a battle of 200,000 men." সুতরাং নিছক বাঁচার তাগিদেই ইংল্যাণ্ড শেষপর্যন্ত ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হবে।

ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ করা ছাড়া মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ঘোষণা করার পিছনে নেপোলিয়ানের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য হলো ইংল্যাণ্ডের কাছ থেকে ইউরোপের বাজার কেড়ে নিয়ে, সেখানে ফ্রান্সের বাজার তৈরী করা। অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের যেখানে ক্ষতি, ফ্রান্সের লাভ সেখানেই। এর ফলে ফ্রান্সে শিল্পোদ্যোগের জোয়ার আসবে। যে সমৃদ্ধি ছিল ইংল্যাণ্ডের গর্বের বস্তু, তা ফ্রান্সের করায়ত্ত হবে। সেন্ট হেলেনায় নির্বাসন কালে নেপোলিয়ান দাবী করেছিলেন যে, তিনিই ফ্রান্সে আধুনিক শিল্পের জনক। তাঁর এই দাবী হয়ত সর্বাংশে সত্য নয়, তবু এ কথা সত্য যে, শিল্পে আধুনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করে তিনি ফ্রান্সে এক শিল্প বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। যাই হোক এই শিল্প প্রয়াসের ফলে তিনি ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন আশা করেছিলেন। এই ভাবে তিনি ফ্রান্সে তাঁর একনায়কতন্ত্রের ভিতকে আরও শক্তিশালী করার কথা চিন্তা করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অস্ত্র নেপোলিয়ান ব্যাপকভাবে ও সুপরিকল্পিত পথে প্রথম ব্যবহার করলেও তাঁর মাথা থেকেই এই পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটে নি। বস্তুতঃ বিপ্লব চলার সময়েই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হ'য়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে বাঁধার পরই ফ্রান্সের বাজারে ইংল্যাণ্ডের দ্রব্যসামগ্রী নিষিদ্ধ করা হ'য়েছিল। ১৭৯৫ সালে ওলন্দাজ নৌ-শক্তির সঙ্গে এক চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় মহাদেশ যাতে ইংল্যাণ্ডের তৈরী দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় নিষিদ্ধ হয়, তার জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এমন কি বিপ্লবের আগেও এই ধরণের অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে এই সব প্রচেষ্টা ছিল বিক্ষিপ্ত।

মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা সফল হ'লে অবশ্যই ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতো। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এই সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল কতটুকু? আগেই বলেছি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে নেপোলিয়ানের পরিকল্পনা অভ্রান্ত ছিল। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে দুটি বিষয় খেয়াল করা অত্যাবশ্যক ছিল। প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ডের তৈরী জিনিস যাতে ইউরোপের বাজারে ঢুকতে না পারে, তার জন্য ইউরোপের সম্পূর্ণ তটরেখা জুড়ে ফরাসী কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করা জরুরী ছিল। অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে তখনও ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেগুলিকে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের কোন জাহাজ যাতে ইউরোপের কোন বন্দরে, এমনকি আঘাটায়, ঢুকতে না পারে, তার জন্য জোরদার টহলের ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজ একমাত্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী নৌ-বহরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপের মানুষের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্য ফ্রান্সে

Scanned with CamScanner

তৈরী জিনিসপত্র দিয়ে ইউরোপের চাহিদা মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দুটি বিষয়ই ছিল এক প্রকার ফ্রান্সের সাধ্যাতীত। ইউরোপের যে সব অঞ্চলে নেপোলিয়ানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি, সেগুলি দখল করা কষ্টসাধ্য কাজ হলেও হয়ত অসম্ভব ছিল না, অন্ততঃ নেপোলিয়ানের মত সমরনায়কের পক্ষে। কিন্তু সমগ্র ইউরোপের তটরেখা পাহারা দেবার মত শক্তিশালী নৌ-বহর ফ্রান্সের ছিল না এবং তা রাতারাতি গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। ইংল্যাণ্ডের নৌ-বহর ছিল বিশ্বসেরা। সুতরাং ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের বাজার নষ্ট করার কাজ এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সেও রাতারাতি শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে ফ্রান্সের তৈরী দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউরোপের চাহিদা মেটানোর পরিকল্পনাও এক প্রকার অবাস্তব ছিল। নেপোলিয়ানের মত বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ তাঁর এই সব সীমাবদ্ধতার কথা কেন বুঝতে পারেন নি, তা বলা কঠিন। অর্থনীতির জগতে নেপোলিয়ান যেন এক কল্পলোকের বাসিন্দা ছিলেন। মারখামের ভাষায়— "In economics as in naval strategy, Napoleon's sense of reality deserted him, and he acted on doctrinaire principles and prejudice." মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ঘোষণা করে নেপোলিয়ান মারাত্মক ভুল করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সর্বনাশ করতে গিয়ে তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। যে তিনটি ভুলের কথা তিনি নিজ মুখে স্বীকার করেছিলেন, সেগুলিরও উৎস ছিল মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা। অর্থাৎ এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়েই তিনি একের পর এক নানা ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কি ভাবে তা হ'য়েছিল, সে কথায় আমরা পরে আসছি।

লিফালগারের পর নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নৌ-যুদ্ধ স্থগিত রাখেন। কিন্তু ১৮০৬ সালে প্রাশিয়াকে পরাজিত করার পর ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করার জন্য তিনি ঐ বছর নভেম্বর মাসে বার্লিন থেকে এক ঘোষণাপত্র জারী করে ইংল্যাণ্ড ও তার উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ ঘোষিত হলো। পরে তিনি তাঁর ভাই লুইকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "I mean to conquer the sea by the land." রাশিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই এই নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজী হলো। কয়েক মাস পরে অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এইভাবে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ঘোষণা করে নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডকে ইউরোপে মিত্রহীন করতে সক্ষম হন। ইংল্যাণ্ডও চুপ করে বসে রইলো না। বার্লিন ডিক্রীর প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড অডার্স ইন কাউন্সিল (orders in council) জারী করে ফ্রান্স ও ইউরোপের বিরুদ্ধে পাল্টা নৌ-অবরোধ ঘোষণা করলো। নিরপেক্ষ কোন দেশের জাহাজ যাতে ফ্রান্স ও ইউরোপে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই এই ঘোষণাপত্র জারী করা হয়। কোন জাহাজ যদি এই নির্দেশ অমান্য করে, তাহ'লে সেই জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর বিরুদ্ধে নেপোলিয়ান ১৮০৭ সালে ফন্‌টেনব্লু (Fontainebleau) ও মিলান (Milan) ডিক্রী জারী করে ঘোষণা করেন যে, নিরপেক্ষ দেশের যে সব জাহাজ অডার্স-ইন-কাউন্সিল মেনে নেবে, তাদের বিট্রিশ জাহাজ বলে মনে করা হবে এবং তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। সংক্ষেপে এই হলো মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা।

মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয় নি, অন্ততঃ প্রথম দিকে এর ফলে ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল। ১৮০৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হ'য়েছিল এবং



বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এদিকে অডার্স ইন কাউন্সিল কার্যকরী করতে গিয়ে ইংল্যাণ্ড নিজের সৃষ্ট জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে তার সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল এবং ১৮১২ সালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বেঁধেছিল। বস্তুতঃ নেপোলিয়ান যদি আরও কিছু কাল ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই অবরোধ চালিয়ে যেতে পারতেন, তাহ'লে হয়ত তিনি সফল হতেন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না বলেই এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যে অস্ত্র নেপোলিয়ান ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন তা ইংল্যাণ্ডকে যতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, তার চেয়েও বেশি আহত করেছিল ফ্রান্সকে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মত তা সৃষ্টিকর্তারই সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ইংল্যাণ্ড প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছিল। ১৮০৭ সালে সে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের উপর বোমাবর্ষণ করে তার নৌ-বহর দখল করে নিয়েছিল। এর ফলে বাল্টিক সাগর অঞ্চলে ইংল্যাণ্ড প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল। তার নৌ-শক্তি আরও বেড়েছিল। অবশ্য তখনই এই বিজয় ইংল্যাণ্ডের কাজে আসে নি, কারণ ১৮০৮ সালে ইংল্যাণ্ডের রপ্তানী হ্রাস পেয়েছিল। তবু এই ঘটনা ফ্রান্সের নৌ-শক্তির দুর্বলতা তুলে ধরেছিল। অন্যদিকে ইউরোপের বাজার ইংল্যাণ্ডের হস্তচ্যুত হ'লেও এবং তার ফলে তার যথেষ্ট ক্ষতি হলেও ইংল্যাণ্ডের বণিকরা ইউরোপের বাইরে দক্ষিণ আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে তাদের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে এই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিতে সক্ষম হ'য়েছিল। ১৮০৬ সালে আর্জেন্টিনা, ১৮০৮ সালে ব্রাজিল ও নিকট প্রাচ্য, ১৮০৯ সালে তুরস্ক এবং ১৮১০ সালে বাল্টিকের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাছাড়া হেলিগোল্যাণ্ড ও মাল্টা থেকে ইংরেজ বণিকরা প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড, স্পেন, নেপলস্ প্রভৃতি অঞ্চলে গোপনে অবৈধ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সের পক্ষে এই অবরোধ দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সেখানকার বন্দরগুলিতে কাজকর্ম এক প্রকার বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল এবং সেগুলি ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। কাঁচামালের অভাবে শিল্প প্রয়াস ব্যাহত হ'য়েছিল। সরকারের আয় কমে গিয়েছিল। এদিকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ইউরোপে গমের পাহাড় জমে উঠছিল। এই অবস্থায় নেপোলিয়ান বুঝতে পারছিলেন যে, মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। ফলে তিনি নিজেই এই ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল করতে বাধ্য হন। তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে কয়েকটি বিশেষ ও নির্বাচিত দ্রব্য আমদানির জন্য 'লাইসেন্স' বা অনুমতিপত্র প্রদান করতে থাকেন। সেইসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে খাদ্যশস্য রপ্তানীর জন্যও তিনি অনুমতি দেন। সবচেয়ে বড় পরিহাসের বিষয় এই যে, ১৮১০ সালে ইংল্যাণ্ড যখন প্রচন্ড খাদ্যাভাবে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন স্বয়ং নেপোলিয়ান গম রপ্তানি করে ইংল্যাণ্ডকে এই আসন্ন সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এই ঘটনা তাঁর বদান্যতার পরিচয় দেয় না। আসলে ইংলাণ্ডের সঙ্গে আমদানি রপ্তানি ছিন্ন করায় ফরাসী বণিকরাও খুব অসুবিধায় পড়েছিল। উদ্বৃত্ত গম অবিক্রীত থাকায় তাদের যথেষ্ট লোকসান হচ্ছিল। আবার ইংল্যাণ্ডজাত পণ্যসামগ্রীর অভাবে ফ্রান্সের মানুষেরও যথেষ্ট অসুবিধা হচ্ছিল। কাজেই নেপোলিয়ানের পক্ষে তাঁর কঠোর নীতি মেনে চলা সম্ভব হচ্ছিল না। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন— "Undoubtedly

Scanned with CamScanner

we must harm our foes, but above all we must live". কিন্তু এই ধরণের একটা চরম পরিস্থিতির সম্ভাবনা সম্পর্কে নেপোলিয়ান কেন আগে থেকেই আশঙ্কা করতে পারেন নি, তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য।

মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার ফলে নেপোলিয়ান ইউরোপে তাঁর জনপ্রিয়তা হারান। সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনায় তিনি ইউরোপের সর্বত্র মুক্তিদাতা হিসাবে অভিনন্দিত হ'য়েছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যের অর্থ ছিল ইউরোপে বিপ্লবের সম্প্রসারণ। কিন্তু মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা তাঁর সাম্রাজ্যবাদী ও অত্যাচারী স্বরূপ উন্মোচিত করে দেয়। ফ্রান্সের শিল্পায়ন করতে গিয়ে তিনি ইউরোপের স্বার্থ বিসর্জন দেন। ১৮১০ সালে তিনি তাঁর ভাই ইউজিনকে (Eugene) একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"My Policy is France before all." মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা জারী করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের বাজার ধ্বংস করে ফ্রান্সের জন্য তা দখল করা। কিন্তু তাঁর জন্য যে দ্রুত শিল্পায়ন অত্যাবশ্যক ছিল, বাস্তবে তা সম্ভব ছিল না। ফলে শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর অভাবে ইউরোপের মানুষ প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাদের সমস্ত দুরবস্থার জন্য তারা নেপোলিয়ানকে দায়ী করেছিল। নেপোলিয়ান প্রথমে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্যই তিনি এই অবরোধ প্রথা জারী করেছেন। কিন্তু অচিরেই ইউরোপের মানুষ বুঝতে পারে যে, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ যেমন কাম্য এবং সমর্থনযোগ্য নয়, ফরাসী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রেও তেমনই তা একইভাবে প্রযোজ্য। আবার লাইসেন্স দানের ক্ষেত্রেও তিনি কেবলমাত্র ফরাসী বণিকদের সুযোগ দেওয়ায়, তাঁর মিত্র রাষ্ট্রগুলি, বিশেষতঃ রাশিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়। তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষকে ক্ষিপ্ত করেছিল।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ও পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা জারী করে তিনি ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণীরও বিরাগভাজন হ'য়েছিলেন। প্রথমে তিনি আশা করেছিলেন যে, এই ব্যবস্থা ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণীর সামনে যে সুযোগ এনে দেবে, তাতে তারা তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তিনি এও জানতেন যে, তাঁর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল এই বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থনের উপর। কিন্তু ১৮১০-১১ সালে ফ্রান্সে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, ফ্রান্সের বুর্জোয়া শ্রেণী তার জন্য নেপোলিয়ানকেই দোষী করেছিল। ফলে ফ্রান্সের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী এই শ্রেণীর সমর্থন হারিয়ে নেপোলিয়ান যথেষ্ট অসহায় হ'য়ে পড়েছিলেন। আসলে প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী নেপোলিয়ানের একনায়কতন্ত্র অন্তর থেকে মেনে নিতে পারছিল না। তারা সরকারে অংশ গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। তাই নেপোলিয়ানের ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় তারা তাঁকে পরিত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু শুধু বুর্জোয়া শ্রেণীই নয়, ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীও নেপোলিয়ানের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। শ্রমিক ছাঁটাই এবং বেকার সমস্যা তাদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মুলহাউসে (Mulhouse) ৬০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ৪০,০০০ এবং লিয়ঁতে (Lyon) ২৫,০০০ শ্রমিকের মধ্যে ২০,০০০ শ্রমিক বেকার হ'য়ে গিয়েছিল। ভুখা মানুষ সম্পর্কে নেপোলিয়ানের ভীতি ছিল। তিনি বলতেন—



"I fear insurrections caused by shortage of bread. I would fear them more than a battle of 200,000 men." অনেকটা এই কারণেই নেপোলিয়ান মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার বাঁধন কিছুটা শিথিল করতে বাধ্য হন।

নেপোলিয়ানের মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা শেষপর্যন্ত চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হ'য়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হলেও সেখানকার তৈরী দ্রব্যসামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা ইউরোপে ছিল এবং অবৈধভাবে তা ইউরোপের বাজারে চালান হতে থাকে। ব্যাপক চোরা কারবারী আটকানো বন্ধ করার কোন ক্ষমতাই নেপোলিয়ানের ছিল না। সুইডেনের গোটেনবার্গ (Gotenburg), হেলিগোল্যাণ্ড (Heligoland), জিব্রাল্টার (Gibraltar), মাল্টা (Malta), আইওনীয় (Ionian) দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি পথে ব্রিটিশ দ্রব্য সামগ্রীর চোরাকারবারী অবাধভাবে চলতে থাকে। এই অবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি ছিল স্বাভাবিক ঘটনা এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর প্রধানরা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বস্তুতঃ চোরাপথে চালান এমন পর্যায় পৌঁছেছিল যে, চোরাই জিনিসপত্র ধরা পড়লেও কারও কোন ক্ষতি হতো না, কারণ এর বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থাও ছিল। কাজেই চোরাকারবারের ব্যবসা দিন দিন ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। এমন কি স্বয়ং নেপোলিয়ান তাঁর সেনাবাহিনীর জন্য ইংল্যাণ্ডের কাপড় ও জুতো আমদানি করে তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথাকে এক প্রহসনে পরিণত করেন।

মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কার্যকরী করতে গিয়েই নেপোলিয়ান তাঁর ক্ষমতার সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। সমগ্র ইউরোপের উপর আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। অথচ মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা সফল করার সেটাই ছিল অন্যতম আবশ্যিক শর্ত। এই জন্যই তিনি স্পেন অধিকার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যার পরিণতি ছিল peninsular war বা উপদ্বীপের যুদ্ধ। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, স্পেনীয় ক্ষত তাঁর সর্বনাশ করেছিল। রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্দারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ও শেষপর্যন্ত মস্কো অভিযানের জন্যও দায়ী ছিল এই মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা। আবার রোমের পোপ যখন তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা মানতে অস্বীকার করেন, তখন তিনি তাঁর রাজ্য দখল করে এবং পোপকে বন্দী করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এই তিনটি ভুলের কথাই নেপোলিয়ান নিজ মুখে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সব ভুলের পিছনে যে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যাই হোক মহাদেশীয় অবরোধ প্রথার ফলেই নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যভুক্ত ও মিত্ররাজ্যগুলি যখন দেখল যে, তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং বন্দরগুলি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন তারা নেপোলিয়ানের নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য তৎপর হলো। ১৮০৯ সালে তুরস্ক, পর্তুগাল এবং স্পেন ও তাঁর উপনিবেশগুলি তাঁর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলো। ১৮১০ সালে রাশিয়া তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। এমন কি হল্যাণ্ড, যেখানে তাঁর ভাই লুই রাজত্ব করছিলেন, ১৮১০ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের তৈরী জিনিসপত্র আমদানি করেছিল। এমনকি একটু আগেই আমরা বলেছি যে, স্বয়ং নেপোলিয়ান তাঁর সুর নরম করতে বাধ্য হন। কাজেই দেখা যাচ্ছে মহাদেশীয় প্রথা জারী করে নেপোলিয়ান নিজেই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। ইংল্যাণ্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই জব্দ হ'য়ে যান। তাঁর এই মারাত্মক ভুলের কোন ক্ষমা নেই।

Scanned with CamScanner

## স্পেনীয় ক্ষত

মহাদেশীয় অবরোধ ঘোষণার দু-বছর এবং টিলজিটে সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার এক বছরের মধ্যেই নেপোলিয়ান উপদ্বীপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এর জের চলেছিল ১৮১৩ সাল পর্যন্ত। স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেপোলিয়ান প্রথম একটি সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখোমুখি হন এবং স্থলযুদ্ধে এখানেই তাঁর প্রথম ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল। এই ধাক্কা তিনি সামলে উঠতে পারেন নি। ফিশারের ভাষায়— "with Napoleon's Spanish enterprise the first cracks began to appear in the fabric of the French Empire." কুদে অবশ্য মন্তব্য করেছেন— "It is unlikely that the decline of his fortunes from this time was inevitable." এই দুই বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উপদ্বীপের যুদ্ধে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন সূচিত হলেও এবং এখানে তাঁর ব্যর্থতা ইউরোপের অন্যত্র আশার সঞ্চার করলেও তখনই সব কিছু নিঃশেষ হ'য়ে যায় নি।

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ান উপদ্বীপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও সেটাই স্পেন আক্রমণের একমাত্র কারণ ছিল না। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের তটরেখার উপর ফরাসী প্রাধান্য স্থাপন অবশ্যই জরুরী ছিল এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পর্তুগালের রাজাকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করতে বলেন। পর্তুগাল এই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃত হওয়ায় ফ্রান্স ও স্পেনের একটি যৌথ সেনাবাহিনী ১৮০৭ সালে পর্তুগাল আক্রমণ করে। পর্তুগালের রাজ পরিবার ব্রাজিলে পালিয়ে যান। নেপোলিয়ান পর্তুগালকে পরাজিত করে তাকে মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা মানতে বাধ্য করেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের মূল উদ্দেশ্য ছিল পর্তুগালের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনও অধিকার করা। ট্রাফালগারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই স্পেনের নৌ বহরের দিকে তাঁর নজর ছিল। তিনি মনে করতেন স্পেনের দুর্বলতা ও অধঃপতনের জন্য দায়ী ছিল রাজ পরিবারের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা। স্পেনের বুর্বো বংশসম্ভব রাজা চতুর্থ চার্লসের কোন যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব ছিল না। রানীর অনুগৃহীত ও আস্থাভাজন গড়য়ের (Godoy) হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। পর্তুগাল দখলের আশায় তিনি ১৮০৪ সাল থেকেই ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ানও যেমন স্পেনের দুর্বল ও অনিশ্চিত সামরিক সাহায্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না, গড়য়ও তেমনই নেপোলিয়ানের উপর খুশী ছিলেন না। শেষপর্যন্ত নেপোলিয়ান যখন পর্তুগাল অধিকার করার কথা চিন্তা করেন, তখন গড়য়কে দক্ষিণ পর্তুগাল দানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি স্পেনের সাহায্য আশা করেন। এই অবস্থায় ১৮০৭ সালের অক্টোবর মাসে নেপোলিয়ান জুনোর (Junot) নেতৃত্বে পর্তুগালে এক সেনাবাহিনী পাঠান। ঠিক সেই সময় স্পেনে এক অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দেয়। যুবরাজ ফার্দিন্যাণ্ড (Ferdinand) সন্দেহ করেন যে, চার্লসের মৃত্যুর পর গড়য় স্পেনের সিংহাসন দখল করার জন্য চক্রান্ত করছেন। তাই গড়য়কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তিনি নেপোলিয়ানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্পেনের এই অভ্যন্তরীণ সংকটের সুযোগে নেপোলিয়ান স্পেন দখল করার পরিকল্পনা করেন। তিনি মুরাটের (Murat) নেতৃত্বে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে এক সেনাবাহিনী পাঠান। এদিকে ফার্দিন্যাণ্ডের সমর্থনে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। চার্লস সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং গড়য় বন্দী হন। ফরাসী সেনাবাহিনী তৎপরতার



সঙ্গে স্পেন দখল করে। এরপর নেপোলিয়ন পিতাপুত্র উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করে নিজ ভাই জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসান। স্পেন দখল সম্পূর্ণ হয়।

যেভাবে নেপোলিয়ান স্পেন দখল করেন, তা তাঁর অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক হঠকারিতার পরিচায়ক। তিনি আগাগোড়াই ভুল করেছিলেন। তিনি স্পেনের পরিস্থিতি যথাযথ বুঝতে পারেন নি। কুদের ভাষায়—" It was a serious miscalculation." স্পেনের জনগণ সমস্ত ঘটনাটিকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিল, সে সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তাঁর মনে হ'য়েছিল স্পেনে তাঁকে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না। তিনি মুরাটকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন— "If there are movements in Spain, they will resemble those we have seen in Egypt." মুরাটও তাঁকে কিছুটা ভুল বুঝিয়েছিলেন। আসলে নেপোলিয়ান যখন বেয়নে (Bayonne) চার্লস ও ফার্দিন্যাণ্ডকে ডেকে কথাবার্তা বলছিলেন এবং যতক্ষণ না তিনি উভয়কেই পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন ততক্ষণ স্পেনবাসীরা চুপচাপ ছিল। তারা আশা করেছিল নেপোলিয়ান ফার্দিন্যাণ্ডকে সমর্থন করবেন। কিন্তু নেপোলিয়ান স্পেনের সিংহাসনে নিজ ভাই জোসেফকে স্থাপন করায় মাদ্রিদের জনগণ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মুরাট কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু তখনও নেপোলিয়ান স্পেনবাসীর মনোভাব বুঝতে পারেন নি। তিনি দম্ভ সহকারে ট্যালির‍্যাণ্ডকে একটি চিঠিতে লেখেন— "Some agitatious may take place, but the good lesson which has just been given to the city of Madrid will naturally soon settle affairs."

নেপোলিয়ানের এই আত্মতৃপ্তি ও ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হ'য়েছিল। স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়। জোসেফ এগারো দিনের পর রাজধানী ছাড়তে বাধ্য হন। একদিকে যেমন স্পেনের কৃষকেরা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে, অন্যদিকে তেমনই রাজনৈতিকভাবে নেতারা জুন্টা (junta) বা রাষ্ট্রীয় মহাসভা গঠন করে স্থানীয় শাসন নিজেদের হাতে তুলে নেয় এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইংল্যাণ্ডের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ক্যাডিজে (Cadiz) একটি কেন্দ্রীয় জুন্টা স্থাপিত হয়। ১৮০৮ সালের মেডিনা ডেল রিও সেকোর (Medina del Rio Seco) যুদ্ধে কিন্তু নেপোলিয়ান সহজেই স্পেনের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এর ফলে নেপোলিয়ানের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। কিন্তু বেলেনের (Beylen) যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হয়। এই ঘটনা ইউরোপকে চমকিত করে। নেপোলিয়ান অপরাজেয়—এই ধারণা ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। এই যুদ্ধ নেপোলিয়ানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে নেপোলিয়ান জার্মানী থেকে তাঁর সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠান এবং নিজে স্পেনের যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইংরাজ সেনাপতি স্যার জন মুরকে (Sir John Moore) করুন্নার (Corunna) যুদ্ধে প্রায় পরাজিত করেন। কিন্তু এর পরই নেপোলিয়ান ইউরোপের অন্যান্য নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় স্পেন পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ব্যক্তিগতভাবে আর স্পেনীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। এদিকে ১৮০৮ সালে স্যার আর্থার ওয়েলেসলির (Arther Wellesley) নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য পর্তুগাল অভিযান করে ভিমিরোতে (Vimiero) ফরাসীদের পরাজিত করে। এই অবস্থায় ফরাসী সেনানায়ক জুনো সিন্ত্রার (Cintra) কনভেনশন অনুযায়ী পর্তুগাল থেকে তাঁর সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। ইংরেজরা পর্তুগালের রাজধানী লিসবন (lisbon) দখল করে নেয় এবং সেখান থেকে স্পেনীয় গেরিলাদের সাহায্য পাঠাতে থাকে। তবে করুন্নায় (Corunna) মুরের প্রায় পরাজয় ইংরেজদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় কিছুটা হতাশার

Scanned with CamScanner

সঞ্চার করেছিল। ১৮০৯ সালে ওয়েলেসলি ট্যালাভেরার (Talavera) যুদ্ধে জয়লাভ করলেও স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ দখল করতে পারেন নি। তিনি পর্তুগালে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

উপদ্বীপের যুদ্ধের মোড় ঘোরে ১৮১০-১১ সালে। ১৮১০ সালে নেপোলিয়ান তাঁর সেনা সেনানায়ক মেসেনাকে (Messana) স্পেনে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেন; সঙ্গে পাঠান ১,৪০,০০০ জন সৈনিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দক্ষিণ স্পেনে অবস্থানরত ফরাসী সেনানায়ক সুল্ট (Soult) তাঁর সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা করলেন না। আসলে উভয় সেনানায়কের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। অথচ ঠিক এই সময় স্পেনের প্রাদেশিক জুন্টা ও গেরিলাবাহিনী যুদ্ধের উদ্যম ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলায় ফ্রান্সের সামনে একটা বড় সুযোগ ছিল এবং সেনাপতি মেসেনা যদি তা কাজে লাগাতে পারতেন, তাহলে স্পেন বিজয় তখন অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সুল্টের অসহযোগিতার ফলে তিনি টোরেস ভেড্রাস-এর (Torres Vedras) যুদ্ধে পরাজিত হন। এর পর ওয়েলিংটন (আর্থার ওয়েলেসলি) ১৮১২ সালে স্যালামাঙ্কা (Salamanca) ও ১৮১৩ সালে ভিটোরিয়ার (Vittoria) যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজিত করে তাদের স্পেন থেকে হটিয়ে দেন। নেপোলিয়ানের স্পেন জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

নেপোলিয়ানের সামরিক বিজয় অভিযান প্রথম বাধা পায় স্পেনে। নেপোলিয়ানের এই ব্যর্থতা অস্বাভাবিক ছিল না। স্পেনেই প্রথম নেপোলিয়ান একটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সুসংগঠিত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হ'য়েছিলেন। স্পেনের এই প্রতিরোধকে জাতীয় সংগ্রাম বলা চলে কি না তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। আপাততঃ আমরা সে প্রসঙ্গ ও বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু যেভাবে নেপোলিয়ান চতুর্থ চার্লস্ ও ফার্দিন্যাণ্ড উভয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করে নিজের ভাই জোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসান, তাতে স্পেনের মানুষের দম্ভ ও মর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। রাজভক্ত প্রজাদের কাছে নেপোলিয়ানের আচরণ ঘোরতর অন্যায় বলে মনে হ'য়েছিল। নেপোলিয়ান যদি ফার্দিন্যাণ্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসিয়ে স্পেনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপের অবসান ঘটাতেন, তাহ'লে হয়ত স্পেনের মানুষ তা মেনে নিত। অর্থাৎ তিনি স্পেনের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলেই স্পেনের মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে যায় নি। আসলে রাজতন্ত্রে আস্থাশীল স্পেনবাসী বিদেশী যোসেফকে স্পেনের রাজা বলে মানতে রাজী ছিল না। সেই কারণে নেপোলিয়ানের আচরণ তাদের কাছে অত্যাচার বলে মনে হ'য়েছিল। এর পিছনে যথেষ্ট জনসমর্থন ছিল। কাজেই তারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। অন্যদিকে নেপোলিয়ান স্পেনের মানসিকতা ও ক্ষমতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। তাঁর দম্ভ, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং আস্থা তাঁর সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া তিনি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা না করায় এবং ইউরোপের অন্যান্য সমস্যায় জড়িয়ে পড়ায় প্রতিপক্ষের যথেষ্ট সুবিধা হ'য়েছিল। সেই সঙ্গে ফ্রান্সের সেনানায়কদের অযোগ্যতা ও অপদার্থতা এবং তাঁদের স্বার্থপর মনোবৃত্তি ও পারস্পরিক হিংসা ও দ্বন্দ্ব প্রতিপক্ষের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছিল। জোসেফকে নেপোলিয়ান স্পেনের রাজা করলেও তিনি ছিলেন অযোগ্য ও অপদার্থ। পরিস্থিতি সামাল দেবার ও নেতৃত্ব দেবার কোন ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। সুতরাং স্পেনে নেপোলিয়ন ক্ষমতার ভিত কখনই শক্তিশালী ছিল না। স্পেনে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার আর একটি বলো সেখানকার ভূ প্রকৃতি ও জলবায়ু। স্পেন ছিল পর্বতসঙ্কুল একটি দেশ। প্রতিকূল এই ভৌগোলিক পরিবেশে নেপোলীয় বাহিনীর



স্বাভাবিক দক্ষতা দেখানোর কোন সুযোগ ছিল না। এই পরিবেশের মানানসই রণকৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ। স্পেনের সৈনিকরা এই ধরণের যুদ্ধে দক্ষ হলেও ফরাসীরা তা ছিল না। কাজেই তাদের ব্যর্থতা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ছিল। স্পেনের জলবায়ুর সঙ্গেও ফরাসী সৈনিকরা মানিয়ে নিতে পারে নি। সব শেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ইংরেজদের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা। উপদ্বীপের যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার যে সুযোগ পেয়েছিল, তারা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। স্পেন ও পর্তুগালের পক্ষ নিয়ে তারা আসল লড়াই করছিল তাদের চিরশত্রু ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। তাদের পক্ষে ছিল আর্থার ওয়েলেসলি বা ডিউক অব ওয়েলিংটনের মত দক্ষ ও যোগ্য সামরিক নেতা। রুদে অবশ্য ওয়েলিংটনের প্রতিভা ও স্পেনবাসীদের উদ্দীপ্ত সংগ্রামের সাফল্যের পিছনে আরও একটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে স্পেনবাসীর সাফল্য অষ্ট্রিয়া সহ সারা ইউরোপে যে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, তা কেবল নেপোলীয় বিরুদ্ধ অন্যান্য শক্তিগুলিকেই অনুপ্রাণিত করে নি, স্পেনের জনগণকেও বাড়তি মনোবল জুগিয়েছিল। এই মনোবল তাদের নতুন ভরসা দিয়েছিল। রুদের এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত হবার কোন কারণ নেই।

নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে স্পেনের এই সংগ্রামকে জাতীয় যুদ্ধ বলা যায় কিনা, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। ডেভিড টমশনের মতে স্পেনবাসীর মধ্যে আঞ্চলিক ও স্থানিক আনুগত্যের বন্ধন ছিল দৃঢ় এবং গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে তাদের যথেষ্ট গর্ব ছিল। ইটালী বা জার্মানীর মত স্পেন কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা ছিল না। স্পেন একটি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র ছিল। তাদের রাজতন্ত্র দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও রাজতন্ত্রের উপর তাদের প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল। তাই নেপোলিয়ান যখন স্পেন দখল করতে প্রয়াসী হন, তখন স্পেনের মানুষ তা মেনে নিতে পারে নি। ডেভিড টমশনের এই বক্তব্যের সঙ্গে রুদে ও মারখাম একমত হতে না পারলেও এ কথা সত্য যে, সেই সময় ফ্রান্সের শত্রুপক্ষ স্পেনের এই সংগ্রামকে স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় অভ্যুত্থান বলেই মনে করেছিল। লণ্ডনে সেরিডান (Sheridan) স্পেনের এই সংগ্রামকে অভিনন্দন জানিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, স্পেনবাসীরা ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপ্ত হ'য়েই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়েছিল। রুদের মতে এই ধারণা ভ্রান্ত, কারণ স্পেনের কৃষকেরা ছিল রক্ষণশীল। তারা ফ্রান্সের বৈপ্লবিক মতাদর্শ দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় নি। অন্যদিকে স্পেনে বুর্জোয়া শ্রেণীর এক প্রকার কোন অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারাও ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নি। এখানেই নেপোলিয়ানের ভুল হ'য়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চলের মত স্পেনের মানুষও তাঁর বৈপ্লবিক সংস্কারগুলিকে স্বাগত জানাবে। এ কথা সত্য যে, বিদ্রোহীরা ১৮১২ সালে যে উদারনৈতিক সংবিধান ঘোষণা করেছিল, তা রচনা করা হ'য়েছিল ১৭৯১ সালের ফরাসী সংবিধানের অনুকরণে। কিন্তু আসলে এর পিছনে কোন আন্তরিকতা ছিল না। প্রচার মূল্য ছাড়া এর কোন গুরুত্ব ছিল না। এর উদ্দেশ্য ছিল জোসেফের উদারনৈতিক সংস্কারগুলিকে প্রতিহত করা। এর মধ্যে সমগ্র স্পেনবাসীর মনোভাব প্রতিফলিত হয় নি। ১৮১৪ সালে যখন ফার্দিন্যাণ্ডকে তাঁর সিংহাসন ফিরিয়ে দেয়া হ'য়েছিল, তখন স্পেনের মানুষ তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এবং ১৮১২ সালের সংবিধানের কথা ভুলে গিয়েছিল। স্পেনে যে গণ

Scanned with CamScanner

অভ্যুত্থান হ'য়েছিল, তার নেতৃত্ব দিয়েছিল নিম্ন যাজক সম্প্রদায় ও পুরোহিত শ্রেণী। চার্চের সম্পত্তির উপর আক্রমণ তাদের ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত করেছিল। মারখাম তাই মনে করেন যে, স্পেনের প্রতিরোধ ছিল মূলতঃ ধর্মীয় ; এর সঙ্গে উনিশ শতকের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর ভাষায়— "The Spanish rising of 1808 was primarily religious, a sort of La Vendee on a large scales.... The Spanish affair cannot, therefore, be regarded as a typical example of national opposition to Napoleon". রুদে স্পেনে অভ্যুত্থানকে La vendee ধাঁচের অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করলেও এর পিছনে দেশপ্রেমের আদর্শ ছিল বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন—"It (Spanish uprising) was also a patriotic movement, concerned to defend the country as well as church and king." তাঁর মতে যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায় ছাড়া ক্যাডিজের (Cadiz) উদারনৈতিক দেশপ্রেমিক বুর্জোয়ারাও এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল। গ্রান্ট ও টেম্পারলিও প্রায় একই কথা বলেছেন : "Religion and national pride were the chief passions of the people, and both passions impelled them to an obstinate resistance to the French." স্পেনের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মত বৈষম্যই থাক না কেন, এর জাতীয়তাবাদী চরিত্র নিয়ে বিতর্ক বোধ হয় অর্থহীন। নেপোলিয়ানের ঔদ্ধত্য ও স্পেনের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় হস্তক্ষেপ এবং অবশেষে চতুর্থ চার্লস ও ফার্দিন্যাণ্ড উভয়কেই অপসৃত করে জোসেফকে স্পেনের সিংহাসন দান স্পেনের মানুষের কাছে ঘোরতর অন্যায় বলে প্রতিভাত হ'য়েছিল। স্পেনের মানুষ অনগ্রসর হলেও তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের অভাব ছিল বলে মনে হয় না। গ্রান্ট ও টেম্পারলির অভিমত যে, ধর্ম ও জাতীয় দম্ভই স্পেনবাসীকে নেপোলিয়ানের বিরোধিতা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল, যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

নেপোলিয়ানের স্বীকারোক্তি, যে স্পেনীয় ক্ষত তাঁর সর্বনাশ করেছিল, অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট নয়। গ্রান্ট ও টেম্পারলির মতে "His (Napoleon's) policy in Spain was his greatest blunder." এই বক্তব্যের সঙ্গে অবশ্য একমত হওয়া কঠিন, কারণ মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়েই নেপোলিয়ান পর্তুগাল ও স্পেনের সমস্যার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তবে এ কথাও সত্য যে, কেবলমাত্র মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য স্পেন দখলের কোন প্রয়োজন ছিল না। স্পেনের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে যেভাবে নেপোলিয়ান জোসেফকে সেখানকার রাজা করেন, তা তাঁর নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্খার পরিচয় দেয়। কিন্তু স্পেনের পরিস্থিতি তিনি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। স্পেনবাসীর মানবিকতা বুঝতে তাঁর ভুল হ'য়েছিল। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও দম্ভ তাঁর বাস্তব দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছিল। স্পেনবাসীর সক্রিয় বিরোধিতাকে তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে চরম ভুল করেছিলেন। তাদের যোগ্যতা ও সামর্থ সম্পর্কে নেপোলিয়ানের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান বা ভূ-প্রকৃতি যে ফরাসী যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও রণকৌশলকে অনেকাংশে ব্যর্থ করে দেবে, তা তিনি কেন বোঝেন নি, বলা দুষ্কর। স্পেনেই নেপোলিয়ানের প্রথম সামরিক বিপর্যয় শুরু হয়। বেলেনের যুদ্ধে পরাজয় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। স্পেনের যুদ্ধে শুধু যে নেপোলিয়ানের প্রচুর অর্থ ব্যয় ও লোকক্ষয় হয়, তাই নয় ; এর নৈতিক প্রভাব হ'য়েছিল সুদূরপ্রসারী। সব চেয়ে বড় কথা নেপোলিয়ান যে অজেয় নন, তা এই প্রথম প্রমাণিত হ'য়েছিল। এর ফলে নেপোলিয়ান বিরোধী শক্তিগুলি



আরও উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল। কোবান দেখিয়েছেন যে, স্পেনে নেপোলিয়ানের ভাগ্য বিপর্যয় অষ্ট্রিয়ার পুনরুত্থানে সহায়ক হয়েছিল : "The French reverses in Spain may have played some part in the resurgence of Austria." আবার স্পেন দখলের জন্য বেশ কিছু সৈনিক নিযুক্ত থাকায়, নেপোলিয়ান ইউরোপের অন্যান্য রণাঙ্গনে তাঁর পূর্ণশক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারেন নি। মনে রাখতে হবে যে, এই যুদ্ধে প্রায় ৫ লক্ষ ফরাসী সৈনিক নিহত হয়। অন্যদিকে স্পেনে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর অন্যতম অনুচর ও সহকর্মী টেলির‍্যাণ্ড এবং ফুশে নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকে নজর দেন। নেপোলিয়ানের পতন হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ পন্থা কি হবে, তাই নিয়ে তাঁরা ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। নেপোলিয়ানের ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনাতেই এবং সাহায্য ও সমর্থনের প্রয়োজন যখন সব চেয়ে বেশি, তখন তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ অনুচর তাঁকে পরিত্যাগ করতে শুরু করেন। এর ফলে নেপোলিয়ানের মনোবল ও আস্থায় চিড় ধরতে থাকে। তবে স্পেনের ঘটনার সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো এই যে, এর ফলে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিল। পর্তুগাল ও স্পেনের উপর নেপোলিয়ানের নগ্ন আক্রমণ ইংরেজ সেনাপতি মুর ও আর্থার ওয়েলেসলিকে ফরাসী সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করার যে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল, তাঁরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থায় ইংল্যাণ্ড যখন বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত, তখন নেপোলিয়ান পর্তুগাল ও স্পেন আক্রমণ করে শুধু নিজের সমস্যারই সৃষ্টি করেন নি, সেই সঙ্গে ইংল্যাণ্ডকেও বাঁচার ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। স্পেনীয় ক্ষত নেপোলিয়ানের শক্তি নিঃশেষিত করে দিয়েছিল। গ্রান্ট ও টেম্পারলি যথার্থই বলেছেন— "The Spanish war has been well called the cancer that drained away the strength of Napoleon."

## রোম, অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার সঙ্গে সংঘাত ঃ

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়ান শুধু পর্তুগাল ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই জড়িয়ে পড়েন নি, এর ফলে রোমের পোপের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ ও সংঘাত বেঁধেছিল। ১৮০১ সালে পোপের সঙ্গে তিনি এক বোঝাপড়ায় আসলেও উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির একটা অবকাশ ছিল। নেপোলিয়ান চার্চকে নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরে বলেছিলেন— "I should have controlled the religious as well as the political world, and summoned church councils like constantine." অন্যদিকে পোপ সপ্তম পিয়ুস (Pius vii) চার্চের স্বাধীনতা রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৮০৫ সালের অক্টোবর মাসে নেপোলিয়ান পোপের রাজ্যের অন্তর্গত আনকোনা (Ancona) দখল করেন। পোপ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এদিকে নেপোলিয়ানের ধারণা হয় যে, পোপ তাঁর শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ১৮০৬ সালে তিনি পোপকে লেখেন— "Your Holiness is sovereign of Rome, but I am its Emperor. My enemies must also be yours." এর পর যখন তিনি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ঘোষণা করেন, তখন তিনি পোপকে তা মানতে নির্দেশ দেন। কিন্তু

পোপ তাঁর নির্দেশ অমান্য করায় নেপোলিয়ান ১৮০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পোপের রাজ্য দখল করে নেন। পোপ তাঁর হাতে বন্দী হন। পোপের সঙ্গে এই বিবাদের ফলাফল নেপোলিয়ানের পক্ষে মোটেই শুভ হয় নি। পোপের প্রতি এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ফলে ক্যাথলিক ইউরোপ নেপোলিয়ানের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'য়েছিল। কাজেই এর নৈতিক ফল হ'য়েছিল মারাত্মক। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের মধ্যে পোপের মর্যাদা ও শক্তি সম্পর্কে একদা নেপোলিয়ান মন্তব্য করেছিলেন—"Treat the Pope as if he had 200,000 men." কিন্তু পোপকে বন্দী করার সময় নেপোলিয়ান তাঁর এই কথার তাৎপর্য ভুলে গিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত পোপকে তিনি বিনা শর্তে রোমে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। তাঁর এই নৈতিক পরাজয়ে নিশ্চয় নেপোলিয়ানের সম্মান বাড়ে নি। নেপোলিয়ান নিজে তাঁর এই ভুলের কথা স্বীকার করেছেন। মারখামের মতে নেপোলিয়ানের সঙ্গে পোপের এই কলহের গুরুত্ব নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কোন যুক্তি নেই। অধিকাংশ ক্যাথলিকই মনে করতো যে, এই কলহের মূলে ছিল চার্চের প্রশাসনিক ক্ষমতা (temporal power), ধর্মীয় ক্ষমতা (religious power) নয়। একথা সত্য যে, স্পেনে গেরিলা বিরোধিতার পিছনে ধর্মীয় উন্মাদনা ও বিরোধিতার একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু তার জন্য পোপের প্রতি নেপোলিয়ানের দুর্ব্যবহার যতটা না দায়ী ছিল, তার চেয়ে বেশি দায়ী ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও মঠগুলির উপর নেপোলিয়ানের আক্রমণ।

নেপোলিয়ানের সঙ্গে যখন পোপের বিরোধ চলছিল, তখন প্রায় সেই সময়েই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে তার অবার সংঘর্ষ বাঁধে। স্পেনের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতা ও বেলেনের যুদ্ধে তাঁর পরাজয় মধ্য ইউরোপে এক নতুন আশার সঞ্চার করেছিল এবং অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া উভয় দেশই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তৈরী হচ্ছিল। অষ্ট্রিয়ার পক্ষে প্রেসবার্গের চুক্তির অপমানজনক শর্তগুলি ভুলে যাওয়া কঠিন ছিল। দেশপ্রেমী অনেক জার্মান চাইছিল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাদের মুক্তি সংগ্রামে অষ্ট্রিয়া নেতৃত্ব দিক। এই অবস্থায় অষ্ট্রিয়াতে জোরদার যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু হয়। নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়ার এই যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। ১৮০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি রাশিয়ার জার আলেকজান্দারের সঙ্গে এরফার্ট (Erfurt) শহরে দেখা করে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের আসন্ন যুদ্ধে তাঁর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। কিন্তু ইসলিং এর (Essling) যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়ার হাতে পরাজিত হ'ন। তবে ওয়াগ্রামের (Wagram) যুদ্ধে তিনি অষ্ট্রিয়াকে পরাস্ত করলেও। তাকে ধ্বংস করতে পারেন নি। যাই হোক ১৮০৯ সালের অক্টোবর মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে স্কনব্রুর্নের (Schonbrunn) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে অষ্ট্রিয়া ইলেরিয়া (Illyria) প্রদেশ ও আরও কয়েকটি অঞ্চল হারায়। এর পর নেপোলিয়ান তাঁর প্রথমা পত্নী জোসেফিনকে ত্যাগ করে অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা মারিয়া লুইজকে বিবাহ করেন।

অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের পর আপাতদৃষ্টিতে নেপোলিয়ানের অবস্থার উন্নতি হ'য়েছিল বলে মনে হয়। একদিকে পোপ বন্দী, অন্যদিকে মেসেনার (Messena) নেতৃত্বে স্পেনের উপর আক্রমণ করতে নেপোলিয়ান তৎপর। কিন্তু বাস্তবের চেহারা ছিল অন্য রকম। নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ও তাঁর পাঁচমিশালী চরিত্র নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য সেনানায়ক নেপোলিয়ানের রণকৌশল ক্রমশঃ আয়ত্ত করে নিচ্ছিল। তাঁর অপরাজেয় ভাবমূর্তি ম্লান ও অতীতের বিষয়ে পরিণত হচ্ছিল। নেপোলিয়ানের ঘনিষ্ঠ অনুচরদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কেরও



অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। প্রাশিয়া ছিল অশান্ত। জার্মানীর ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের নীতি ছিল রিচল্যু (Richelieu) ও চতুর্দশ লুই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা, অর্থাৎ জার্মান বিচ্ছিন্নতাবাদের সুযোগ নিয়ে নিজের আধিপত্য বিস্তার করা এবং জার্মান অনৈক্য বজায় রাখা। কিন্তু ফল হ'য়েছিল বিপরীত। কোড নেপোলিয়ান ও অন্যান্য প্রগতিশীল সংস্কারের মাধ্যমে নেপোলিয়ান জার্মান ঐক্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। জার্মানীর ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও জটিলতাও অনেকাংশে শিথিল করেছিলেন। তবে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বেই গেটে (Goethe), কান্ট (Kant), শিলার (Schiller) প্রভৃতি চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জার্মানীর ভাব জগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, তার ফলে সেখানে এক নব চেতনার অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখনই অবশ্য এর কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। তাছাড়া সাংস্কৃতিক জগতে জাতীয় চেতনার এই উন্মেষ কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮০৬ সালে ফ্রান্সের হাতে প্রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। ফিক্‌টে (Fichte), শ্লেগেল (Schlegel) প্রভৃতি তরুণ চিন্তাবিদ নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ তুলে ধরেন। যাই হোক প্রথমে জার্মান জাতীয়তাবাদীরা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বের উপর নির্ভর করেছিল। কিন্তু নেপোলিয়ানের হাতে অষ্ট্রিয়ার পরাজয়ের ফলে তারা হতাশ হয়। এদিকে প্রাশিয়াতে স্টিয়েন (Stein) ও হার্ডেনবার্গ (Hardenburg) নামে দুজন সংস্কারক মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় সেখানে প্রগতিশীল কিছু সংস্কার গ্রহণ করা হয় এবং তার ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হ'য়েছিল। কিন্তু নেপোলিয়ান প্রগতিশীল এই নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি প্রতিক্রিয়াশীল জার্মান জুঙ্কারদের (Junker) সহায়তায় স্টিয়েনকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। স্টিয়েন অষ্ট্রিয়া হয়ে রাশিয়া যান এবং সেখানে জারের উপদেষ্টা হিসাবে রুশ-প্রাশিয়ার মৈত্রীর উপর জোর দেন। উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়ান বিরোধিতা।

স্টিয়েনের পদচ্যুতির পর প্রাশিয়া নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নি। কিন্তু মস্কো অভিযানে নেপোলিয়ানের ব্যর্থতার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলো। এর ফলে জার্মান জাতীয়তাবাদীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ইয়র্ক (Yorck) নামে প্রাশিয়ার একজন সেনানায়ক রাজার আদেশ অমান্য করে রাশিয়ার সঙ্গে যোগ দেন এবং পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করেন। এদিকে প্রাশিয়ার রাজা যাতে জনগণ কর্তৃক গঠিত একটি সামরিক বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন, তার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা হয়। অবশেষে ১৮১৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত হয় রাশিয়ার সঙ্গে প্রাশিয়ার এক মৈত্রীচুক্তি। প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাইনের রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Confederation of the Rhine) ভেঙ্গে দেয়া হয়। হামবুর্গ (Hamburg) বিদ্রোহ ঘোষণা করে। স্যাক্সনী ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইংল্যাণ্ডও আর্থিক সাহায্য দিতে এগিয়ে আসে। অষ্ট্রিয়া প্রথমে ইতস্ততঃ করলেও পরে যোগ দেয়। এই পরিস্থিতিতেও এবং তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীর দুর্বলতা সত্ত্বেও নেপোলিয়ান তাঁর অনভিজ্ঞ ও উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা ছাড়াই নবনিযুক্ত সৈনিকদের উপর নির্ভর করে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তবে সংখ্যার বিচারে তাঁর সেনাবাহিনী শক্তিশালী ছিল। দু-একটি খণ্ড যুদ্ধে তিনি সফল হন এবং স্যাক্সনীর রাজা আবার তাঁর পক্ষে যোগ দেন। এর পর তিনি ড্রেসডেনের যুদ্ধেও সফল হন। কিন্তু লাইপজিগের (Leipzig) যুদ্ধে (অক্টোবর, ১৮১৩) তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। বিভিন্ন জাতি এক সঙ্গে যুদ্ধ করায় এই

Scanned with CamScanner

যুদ্ধকে "জাতিসমূহের যুদ্ধ" বলে অভিহিত করা হয়। এই যুদ্ধের ফলে নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যায়। বিজয়ী পক্ষ এই সময় নেপোলিয়ানকে একটি সম্মানজনক শান্তির শর্ত দেন। ঠিক হয় ফ্রান্সকে তার "প্রাকৃতিক" সীমারেখা দেয়া হবে। কিন্তু নেপোলিয়ান এই ফ্রাঙ্কফোর্ট (Frankfort) প্রস্তাবে সাড়া দিলেন না। ইংল্যাণ্ডের কাছেও এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য ছিল না। ফলে যুদ্ধের অবসান হলো না। তখনও নেপোলিয়ান রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে আসতে রাজী ছিলেন না। তিনি জার্মান বাহিনীর সেনাপতি ব্লুকারকে পরাজিত করেন। বস্তুতঃ তখনও তাঁর সামরিক শক্তি নিঃশেষিত হয় নি। কিন্তু সেনাবাহিনী ছিল ক্লান্ত। এই অবস্থায় প্রয়োজন ছিল নেপোলিয়ান বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য। এই উদ্দেশ্য ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়া সৌমন্ট-এর (Chaumont) চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৮১৪ সালের ১৩ই মার্চ প্যারিসের পতন ঘটলো। নেপোলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। ফন্টেনব্লুর (Treaty of Fontainebleau) সন্ধি স্বাক্ষর করে নেপোলিয়ান এলবা (Elba) দ্বীপে চলে যান। অবশ্য এখানেই নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে নি। তিনি এলবা থেকে পালিয়ে এসে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্রতী হ'য়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

নেপোলিয়ানের পতনের জন্য জার্মান জাতীয়তাবাদের ভূমিকা কতটুকু ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মারখাম ও রুদে। জার্মান ঐতিহাসিকেরা অবশ্য মনে করেন যে, নেপোলিয়ানের পতনের পিছনে জার্মান জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের (War of Liberation) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রুদে এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেছেন—"The motion dear to many German historians of the past that the Napoleonic system was destroyed by an all German 'war of liberation' is a myth."[১৫] মারখামের মতে জার্মান জাতীয়তাবাদের আদর্শ তখন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আসলে তখন জার্মান জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় নি। কাজেই নেপোলিয়ানের পতনের জন্য জার্মান জাতীয়তাবাদের প্রভাবের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, নেপোলিয়ানের পতনের জন্য দায়ী ছিল তাঁর অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খা ও ইউরোপের রাজন্যবর্গের সমবেত প্রচেষ্টা, জাতীয়তাবাদ নয়। তাঁর ভাষায়—"Napoleon was to be defeated by his own overreaching ambition and by the dynastic ruler."[১৬]

## (৫) রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ ঃ মস্কো অভিযান

মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা, উপদ্বীপের যুদ্ধ ও পোপের প্রতি দুর্ব্যবহারের পর আসা যাক নেপোলিয়ানের আর একটি মারাত্মক ভুল, অর্থাৎ মস্কো অভিযানের আলোচনায়। ১৮০৭ সালের টিলজিটের চুক্তিতে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হলেও, তার ভিত্তি ছিল খুব দুর্বল এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। আসলে তাৎক্ষনিক কিছু সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এই মৈত্রীর ভবিষ্যৎ গোড়া থেকেই উজ্জ্বল ছিল না। উভয়েরই উচ্চাকাঙ্খা ও লক্ষ্যের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের বীজ লুকিয়ে ছিল। উভয়েরই লক্ষ্য ছিল কন্সট্যান্টিপোলস অধিকার করে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নিজ নিজ আধিপত্য স্থাপন করা। ১৮১২ সালে জার আলেকজান্দার যখন তুরস্কের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন, তখন এই সংঘর্ষ ও সংঘাত নগ্নভাবে উন্মোচিত হ'য়েছিল।



স্বার্থের এই সংঘাত প্রমাণ করেছিল যে, আলেকজান্দার ও নেপোলিয়ান পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং উভয় পক্ষই মানসিকভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। নিকট প্রাচ্যে রুশ স্বার্থ ও আকাঙ্খা যদি নেপোলিয়ানের দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে থাকে, একই ভাবে বাল্টিক সাগর অঞ্চলে নেপোলিয়ানের উচ্চকাঙ্খা আলেকজান্দারকে আতঙ্কিত করেছিল। ১৮১০ সালের ডিসেম্বর মাসে নেপোলিয়ান ওল্ডেনবার্গ (Oldenburg) দখল করেন। এই আক্রমণ ছিল টিলজিট চুক্তির পরিপন্থী। তাছাড়া আলেকজান্দারের বোন ছিলেন ওল্ডেনবার্গের রাজ পরিবারের গৃহবধূ। নেপোলিয়ান ডানজিগ (Danzig) বন্দরে সৈন্য সমাবেশ করেন। গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারস্ গঠন করেও নেপোলিয়ান আলেকজান্দারের বিরাগভাজন হন। এর উপর যখন তিনি ১৮০৯ সালে অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে গ্যালিসিয়া (Galicia) দখল করে তা গ্রাণ্ড ডাচি অব ওয়ারশর সঙ্গে যুক্ত করেন, তখন আলেকজান্দার প্রমাদ গোনেন। তাঁর আশঙ্কা হয় নেপোলিয়ান হয়ত স্বাধীন পোল্যাণ্ড গঠন করবেন। ১৮১১ সালের বসন্তকালে রাশিয়া ঐ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করে এবং অবশ্যই তা নেপোলিয়ানের মনঃপুত ছিল না। এই অঞ্চলে নেপোলিয়ানের সঙ্গে আলেকজান্দারের মন কষাকষির আর একটি কারণ হলো সুইডেনের সিংহাসনে বার্নাদোতের দাবীর পিছনে নেপোলিয়ানের সমর্থন। বার্নাদোতে ছিলেন ফরাসীদের মনোগত প্রার্থী। অন্যদিকে সুইডেনের রুশপন্থী দল ছিল তাঁর বিরোধী। কিন্তু এই সব স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল দুটি ঘটনা। প্রথমটি হলো নেপোলিয়ানের সঙ্গে আলেকজান্দারের বোনের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যর্থ পরিকল্পনা। নেপোলিয়ান যখন বুঝেছিলেন যে তাঁর প্রথমা পত্নী জোসেফাইন তাঁকে কোন পুত্রসন্তান উপহার দিতে পারবেন না, তখন তিনি জারের ভগিনী ক্যাথারিনকে (Catharine) বিবাহ করার কথা চিন্তা করেন। কিন্তু জারের দিক থেকেই আগ্রহের অভাবে নেপোলিয়ান হতাশ হন। টিলজিটের চুক্তিতে এইভাবেই ফাটল ধরেছিল। রাশিয়ার অভিজাত শ্রেণী আগাগোড়াই এই মৈত্রীর বিরোধী ছিল। এমন কি তারা আলেকজান্দারকে সিংহাসনচ্যুত করার কথাও চিন্তা করেছিল। আলেকজান্দারের পক্ষে তাই রুশ অভিজাত সম্প্রদায়ের মতামত অগ্রাহ্য করা সম্ভবপর ছিল না। রুশ অভিজাত সম্প্রদায় জারের বোনের সঙ্গে নেপোলিয়ানের বিবাহের প্রস্তাব কখনই সমর্থন করে নি। কাজেই জারের পক্ষে এই প্রস্তাবে সায় দেয়া কঠিন ছিল। কিন্তু হতাশ নেপোলিয়ান যখন অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের রাজকন্যার সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন, জার তখন তাঁর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়ানের সম্পর্কের অবনতির অপর কারণটি হলো মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় অংশ গ্রহনের ফলে রাশিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় নেপোলিয়ানের উপর অত্যন্ত চটে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের সর্বনাশ হ'য়েছিল, কারণ তারা ইংল্যাণ্ডে কাঠ বিক্রী করতে পারছিল না। তাই তারা টিলজিটের চুক্তিকে "শয়তানের সঙ্গে চুক্তি" বলে ধিক্কার জানিয়েছিল। আসলে টিলজিটের চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে না হতেই রাশিয়া খুব অস্বস্তি বোধ করছিল। ১৮০৮ সালে যখন নেপোলিয়ান জারের সঙ্গে এরফার্ট (Erfurt) সমাবেশে মিলিত হন, তখনই ফরাসী মৈত্রী সম্পর্কে আলেকজান্দার নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়েছিলেন। যাই হোক মহাদেশীয় ব্যবস্থা সমর্থন করে রাশিয়া যে ভুল করেছিল, আলেকজান্দারও তা উপলব্ধি করতে পারেন। এর ফলে রাশিয়ার ক্ষতিই হ'য়েছিল। ইংল্যাণ্ডের তৈরী জিনিসপত্রের উপর রাশিয়ার মানুষ অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হবার ফলে রাশিয়ার মানুষের খুব অসুবিধা হয়। ফ্রান্স থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের উপর

Scanned with CamScanner

অত্যধিক হারে শুল্ক চাপান হয়। নিরপেক্ষ দেশগুলির সাথেও বাণিজ্য করার সুযোগ না থাকায় রাশিয়ার অর্থনীতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় রাশিয়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তুলতে তৎপর হয়। ১৮১০ সালে ইংল্যাণ্ডের তৈরী জিনিসপত্রের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। বলা বাহুল্য মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কার্যকরী করার পথে আলেকজান্দারের এই অসহযোগিতা নেপোলিয়ানের পক্ষে মেনে নেয়া কোনভাবেই সম্ভবপর ছিল না। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় আলেকজান্দার তাঁকে সাহায্য না করায় উভয়ের মধ্যে তিক্ততা আরও বেড়েছিল।

নেপোলিয়ানের সঙ্গে আলেকজান্দারের সম্পর্কের এই দ্রুত অবনতির জন্য কোন কারণটি সব চেয়ে বেশি গুরত্বপূর্ণ ছিল, তা বলা কঠিন এবং তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডেভিড টমশনের মতে— "The ostensible reason for Napoleon's attack on Russia was the Tsar's refusal to accept the continental system and cooperate in the bolckade of Britain." অর্থাৎ নেপোলিয়ানের রুশ অভিযানের প্রকাশ্য কারণ ছিল মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে আলেকজান্দারের অনিচ্ছা ও অস্বীকৃতি। মর্ম স্টিফেন্স ও হবসবমও অনুরূপ মত প্রকাশ-করেছেন। গ্রান্ট ও টেম্পারলির মতে উভয় দেশের মধ্যে বিরোধের মূল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল পোল্যাণ্ডের সমস্যা। তাঁর ভাষায়—"Of all the causes of conflict between the two, The Polish question was prabably the most inportant." একটি স্বতন্ত্র বক্তব্য রেখেছেন কোব্যান। তিনি লিখেছেন— "Although British trade with Russia 'was insignificant, this may have influenced Napoleon. More alarming was the fact that in May 1812 Russia concluded peace with the Turks." তিনি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থার চেয়েও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের চুক্তির উপর। রুশ-ফরাসী মৈত্রী ভেঙ্গে পড়ার জন্য কোন কারণটি সবচেয়ে বেশী দায়ী ছিল এক কথায় তার উত্তর দেওয়া দুরূহ হলেও একথা বলা যেতে পারে যে, উভয়ের মধ্যে মৈত্রীর সত্যকারের কোন সুযোগই ছিল না এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত ছিল না। তবে নেপোলিয়ানের দিক থেকে তাঁর পোল্যাণ্ড ও তুরস্ক নীতি যেমন ভ্রান্ত ছিল, তেমনই আলেকজান্দারের উপর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তিনি অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন দেশই নিজের ক্ষতি করে পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে চায় না।

মস্কো অভিযান যে সহজসাধ্য কাজ হবে না, সে সম্পর্কে কিন্তু নেপোলিয়ান নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর একজন ঘনিষ্ট অনুচরকে বলেছিলেন যে, এটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ও জটিল পরিকল্পনা। তাছাড়া স্টেট পিটার্সবার্গের ফরাসী রাষ্ট্রদূতও রাশিয়ার জলবায়ু, সেখানকার মানুষের একগুঁয়ে ও সংগ্রামী মনোভাব এবং সব শেষে রুশ রণকৌশল সম্পর্কে তাঁকে সচেতন ও সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান এই সব সাবধান বাণীকে কোন গুরুত্ব দেন নি। তিনি রুশ দুর্গকে বালির তৈরী দুর্গ ও রুশ জারকে অপদার্থ ও অযোগ্য বলে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটা ছিল মারাত্মক একটি ভুল। যাই হোক তিনি ১৮১২ সালে মস্কো অভিযানের পরিকল্পনা করলেও যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যে সময় নেন, সেই সুযোগে আলেকজান্দার একদিকে সুইডেন ও অন্যদিকে তুরস্কের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে কূটনৈতিক তৎপরতায় নেপোলিয়ানকে পরাজিত করেন ও নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন।



আলেকজান্দার সুইডেনের রাজা বার্ণাদোতেকে (Bernadotte) নরওয়ে অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর মন জয় করেন। এরপর ইংল্যাণ্ড ও সুইডেন রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। সুযোগ বুঝলে প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়াও যে নেপোলিয়ানের বিপক্ষে এই দলে যোগ দেবে, এমন আভাসও পাওয়া গিয়েছিল।

১৮১২ সালে নেপোলিয়ান যখন রাশিয়া অভিযান শুরু করেন, তখন তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষেরও বেশি। তবে এই বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে ফরাসী সৈনিকের সংখ্যা ছিল অর্ধেকেরও কম। বাকী সৈনিকরা এসেছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে, অর্থাৎ নেপোলিয়ানের অধীন বা মিত্র রাষ্ট্রগুলি থেকে— পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি। সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে রাশিয়ার পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। আলেকজান্দার তাই আক্রমণাত্মক নীতির পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে পশ্চাৎ অপসারণ নীতি গ্রহণ করেন। রুশরা 'পোড়ামাটি' নীতি অনুসারে খাদ্যশস্য ধ্বংস করায় ফরাসী সেনাবাহিনী খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। প্রতিকূল জলবায়ুও ফরাসীদের সমস্যা বাড়িয়েছিল। বহু ফরাসী সৈনিক প্রাণ হারায়। যাই হোক ফরাসীরা বোরোদিনোর (Borodino) যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং রাশিয়ার রাজধানী মস্কো দখল করে আগুন লাগিয়ে দেন। নেপোলিয়ান আশা করেছিলেন এই অবস্থায় রাশিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূর্ণ হয় নি। এদিকে খাদ্যাভাবে তাঁর সেনাবাহিনী এক চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়। এরপর যেন নেপোলিয়ানের সমস্যা আরও জটিল করার জন্যই রাশিয়ার মিত্ররূপে প্রচণ্ড শীত পড়লো স্বাভাবিক সময়ের বেশ কিছু আগেই। প্রচণ্ড শীতে নেপোলিয়ানের বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র ৩০,০০০ সৈন্য প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরল। নেপোলিয়ান অবশ্য আগেই ফিরে আসতে বাধ্য হ'য়েছিলেন। এই সময় ফ্রান্সে একটা গুজব রটে গিয়েছিল যে, নেপোলিয়ানের মৃত্যু হ'য়েছে এবং ম্যালেট (Malet) নামে একজন সাধারণতন্ত্রী সেনানায়ক ও ল্যাফোঁ (Lafon) নামে একজন রাজভক্ত পুরোহিত ফ্রান্সে ক্ষমতা দখল করার চক্রান্তে নিযুক্ত হন। এই প্রচেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হ'য়েছিল। প্যারিসে ফিরে নেপোলিয়ান নতুন করে তাঁর সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে মন দেন।

ডেভিড টমশনের মতে রাশিয়া অভিযান ছিল নেপোলিয়ানের সব চেয়ে নাটকীয় ও ক্ষতিকারক যুদ্ধ। বস্তুতঃ এই যুদ্ধে তাঁর প্রচুর লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হ'য়েছিল। তাঁর এই ব্যর্থতা অবশ্য অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। নেপোলিয়ান ক্ষমতার দম্ভে বাস্তব বোধ ও সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা সম্পর্কে ধারণা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ করার আগেই রাশিয়া অভিযান ছিল মারাত্মক একটি ভুল, যা পরবর্তীকালে হিটলার করেছিলেন। রাশিয়ার শক্তিকে তুচ্ছ ও অবহেলা করেও তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দেন নি। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তাঁর ক্ষতি করেছিল। তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য রাশিয়া যে নীতি অনুসরণ করেছিল বা করতে বাধ্য হ'য়েছিল, তা ফরাসী সৈন্যের মরণ ফাঁদে পরিণত হ'য়েছিল। খাদ্যাভাব, মহামারী, প্রতিকূল জলবায়ু সব কিছুই ফরাসী সৈন্যের মরণ ফাঁদে পরিণত হ'য়েছিল। খাদ্যাভাব, মহামারী, প্রতিকূল জলবায়ু সব কিছুই ফরাসী সৈন্যের বিপক্ষে ছিল। নেপোলিয়ান পরে আক্ষেপ করে লিখেছিলেন— "Perhaps

Scanned with CamScanner

I made a mistake in going to Moscow, perhaps I should not have stayed there long." আসলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়। সমগ্র রুশ জাতি যেন ঐক্যবদ্ধভাবে নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'য়েছিল। এই ধরণের গণ জাগরণ তিনি আশা করেন নি। প্যারিসে যখন ফরাসী বিপর্যয়ের খবর আসে, তখন সবাই এক বাক্যে বলেছিল— "এ আর এক স্পেনীয় যুদ্ধ।"

মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়ানের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। সমস্ত ইউরোপ নেপোলিয়ানের এই চরম ব্যর্থতার মধ্যে নতুন আশা ও উৎসাহের আলো দেখতে পেয়েছিল। ফলে নেপোলিয়ান বিরোধী শক্তিগুলি সক্রিয় হ'য়েছিল। নেপোলিয়ানের অপরাজেয় ভাবমূর্তি অতীতের বিষয়ে পরিণত হ'য়েছিল। এই যুদ্ধে নেপোলিয়ানের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হ'য়েছিল, তা পূরণ করা সহজসাধ্য কাজ ছিল না। তবে নেপোলিয়ানও সাধারণ মানুষ ছিলেন না। সুতরাং এই অভিযানে তাঁর যত ক্ষতিই হোক না কেন, তাঁর মনোবল তখনও সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নি বা তখনই সব কিছু শেষ হ'য়ে যায় নি। মনে রাখা দরকার ফ্রান্সের মত রাশিয়ারও প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি হ'য়েছিল এবং নেপোলিয়ানের হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা রাশিয়ার ছিল না। প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়াও সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না। এদিকে নেপোলিয়ান নতুন করে তাঁর সেনাবাহিনী গঠন করে ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন। কিছু পরে রাশিয়া ও প্রাশিয়া যখন একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, তখন তাদের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। কিন্তু নেপোলিয়ানের হাতে ছিল দেড় লক্ষ সৈন্য। তাঁর প্রতিপক্ষরাও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। মধ্য ইউরোপে রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি বা জার্মানীতে প্রাশিয়ার প্রাধান্য— কোনটিই অষ্ট্রিয়া মেনে নিতে রাজী ছিল না। অষ্ট্রিয়ার রাজনীতিবিদ মেটারনিক নেপোলিয়ানের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতেও প্রস্তুত ছিলেন। কাজেই ১৮১৩ সালের গোড়ার দিকে নেপোলিয়ান যদি বুদ্ধিমত্তা ও কূটনৈতিক তৎপরতার পরিচয় দিতে পারতেন, তাহ'লে হয়ত তিনি পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারতেন। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যেকার বিরোধকে নিজের কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু এই সময় তিনি ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে পারেন নি। তিনি নিজের উপর আস্থাও হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ক্লান্তি তাঁকে দুর্বল করেছিল। তাঁর মনে হ'য়েছিল ধারাবাহিক সাফল্য ছাড়া তাঁর পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা অসম্ভব। ১৮১৩ সালের জুন মাসে তিনি মেটারনিককে বলেছিলেন— "I am an upstart soldier. My domination will not survive the day when I cease to be strong, and therefore feared." সুতরাং তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন না। রাশিয়া ও প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে লুটজেন (Lutzen) ও বাউটজেনের (Bautzen) যুদ্ধে তিনি জয়ী হ'য়েও খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। দুটি যুদ্ধই একপ্রকার অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ফলে তিনি যুদ্ধবিরতি শর্তে রাজী হন। দুটি যুদ্ধেই তাঁর বহু সৈনিক মারা যায়। তবে ড্রেসডেনের যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। এটাই ছিল তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য জয়। এরপর লাইপজিগের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নেপোলিয়ান কিভাবে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হন, সে কাহিনী আগে বর্ণনা করেছি।



**নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্তন**— শতদিনের রাজত্ব ও চূড়ান্ত পরাজয় ঃ স্পেনীয় ক্ষত, মস্কো অভিযান এবং মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা নেপোলিয়ানের পতন ত্বরান্বিত করলেও এবং শেষপর্যন্ত তিনি এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হলেও, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার তখনও অবসান হয় নি। তিনি তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ খুঁজছিলেন এবং এলবা থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এলবায় নির্বাসিত হবার দশ মাসের মধ্যেই ১৮১৫ সালের মার্চ মাসে তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। দুটি বিষয় ও ঘটনা তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিল। প্রথমটি হলো তাঁর সিংহাসন ত্যাগের পর ষোড়শ লুই-এর ভাই অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেও ফ্রান্সের মানুষ তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে বরণ করে নি। ফরাসী বিপ্লবের ফলে জমি ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটেছিল, সেগুলি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য ফ্রান্সের মানুষ উদ্বিগ্ন ছিল। দেশত্যাগী বা এমিগ্রিদের ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন অনেকেই সুনজরে দেখে নি। এর ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হ'য়েছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ দেখা গিয়েছিল। ফ্রান্সের নতুন শাসক শ্রেণী তাদের সন্দেহের চোখে দেখতো এবং অনেক সেনানায়ককে অর্ধেক বেতনে অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। কৃষকরাও আশঙ্কা করছিল যে, তারা তাদের জমিজমা আবার সামন্ত প্রভু ও চার্চকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। অষ্টাদশ লুই অবশ্য একটি সনদ বা চার্টার জারী করে ফরাসী জনগণের মন কিছুটা জয় করতে চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অনিশ্চয়তা নেপোলিয়ানের মনে আশার সঞ্চার করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতানৈক্য নেপোলিয়ানের পরাজয়ের পর স্থির হ'য়েছিল ইউরোপের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য ভিয়েনা শহরে এক অধিবেশন বসবে। কিন্তু তা বসার সঙ্গে সঙ্গেই পোল্যাণ্ড, রাইনল্যাণ্ড, স্যাক্সনী ও ইটালীকে কেন্দ্র করে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি এক অত্যন্ত সৃষ্টিকটু বিবাদে লিপ্ত হয়। এমনকি তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নেপোলিয়ানকে উৎসাহিত করেছিল। এই দুটি ঘটনা ছাড়া আরও একটি কারণে নেপোলিয়ান এলবা দ্বীপ ত্যাগ করতে মনস্থ করেন। ফরাসী সরকার নেপোলিয়ান ও তাঁর পরিবারকে ভাতা প্রদান করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি অসন্তুষ্ট হন। তিনি অর্থসঙ্কটে পড়েন। এই অবস্থায় নেপোলিয়ান ফ্রান্সে ফিরে আসেন এবং ফ্রান্সের মানুষ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অষ্টাদশ লুই ফ্রান্স ছেড়ে পালিয়ে যান এবং শুরু হয় নেপোলিয়ানের রাজনৈতিক জীবনের শেষ অধ্যায়— এক শত দিবসের রাজত্ব। কিন্তু নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্তনের অর্থ অবশ্যই স্বৈরতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন নয়। নেপোলিয়ান বুঝেছিলেন যে,হয় তাঁকে পূর্বতন জোকোবিন ও ১৭৯৩ সালের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে, নয় উদারনৈতিকদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে। তিনি দ্বিতীয় পথটি বেছে নেন এবং কার্নো (Carnot) ও বেঞ্জামিন কন্সট্যান্ট (Benjamin Constant) নামে তাঁর দুজন উদারনৈতিক বিরোধীর সঙ্গে হাত মেলান। নেপোলিয়ানের আসল উদ্দেশ্য ছিল সুযোগ বুঝে আবার তাঁর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। দ্রুত একটি সফল যুদ্ধের মাধ্যমেই তা করা সম্ভবপর ছিল।

Scanned with CamScanner

কূটনৈতিক পরিস্থিতি কিন্তু নেপোলিয়ানের পক্ষে ছিল না। এক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের একটি ভুল হ'য়েছিল। এলবা থাকাকালীন তাঁর মনে হ'য়েছিল ভিয়েনা সম্মেলন ভাঙ্গার মুখে এবং ঘরোয়া কলহে মত্ত ইউরোপীয় রাজ্যগুলি তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। আসলে কিন্তু সমাবেশ তখনও ভেঙ্গে যায় নি এবং ভিয়েনায় যখন তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবর আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে "অনাকাঙ্খিত" ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়। মিত্র রাষ্ট্রগুলি নিজেদের বিরোধ ভুলে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের জন্য তৈরী হলো। নেপোলিয়ানও যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন। লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে তিনি বেলজিয়াম সীমান্তে হাজির হলেন। তাঁকে বাধা দিতে প্রস্তুত ছিলেন ইংরেজ সেনানায়ক আর্থার ওয়েলেসলি বা ডিউক অব ওয়েলিংটন ও প্রাশিয়ার সেনানায়ক ব্লুকার (Blucher)। ওয়েলিংটনের হাতে ছিল ৯৬,০০০ সৈন্য ও ব্লুকারের হাতে ১,২৪,০০০ সৈন্য। দুটি বাহিনী যাতে একত্র হতে না পারে তার জন্য নেপোলিয়ান দ্রুত, চকিত ও অকস্মাৎ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি ব্লুকারের নেতৃত্বে প্রাশিয়া বাহিনীকে কোয়াটাঁর ব্রাস (Quatre Bras) যুদ্ধে পরাজিত করেন। কিন্তু তাঁর এই জয় সম্পূর্ণ ছিল না। এর পর তিনি ওয়াটারলুর (waterloo) যুদ্ধে ওয়েলিংটনের মুখোমুখি হন। এই যুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। তাঁর এই পরাজয়ের জন্য ওয়েলিংটনের সামরিক প্রতিভা ও যোগ্য নেতৃত্ব যেমন দায়ী ছিল, তেমনই যুদ্ধের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্লুকারের নেতৃত্বে একদল প্রাশিয়ার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ও সাহায্যেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ের পর নেপোলিয়ান প্যারিসে ফিরে আসেন। জনগণের কাছে আবেদনের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতায় ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি তাঁর পুত্রের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। শেষপর্যন্ত প্রাশিয়ানদের সাহায্যে অষ্টাদশ লুই আবার প্যারিসে ফিরে আসেন। প্যারিসের দ্বিতীয় চুক্তিতে (১৮১৫) ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য এক সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ফ্রান্সের উপর ৭০০ মিলিয়ান ফ্রাঙ্কের এর ক্ষতিপূরণ চাপিয়ে দেয়া হয়। এদিকে নেপোলিয়ান ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পন করেন। এবার তাঁকে ৫০০০ মাইল দূরের মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরে দুর্গম সেন্ট হেলেনা (St Helen) দুর্গে নির্বাসন দেয়া হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান হয়। ১৮২১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৮১৫ থেকে ১৮২১ সাল পর্যন্ত নির্বাসিত জীবন যাপন করলেও এবং তার রাজনৈতিক জীবনের উপর যবনিকাপাত হলেও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে নেপোলিয়ানের জীবনের এই ছয় বছরের ইতিহাস উপক্ষেনীয় নয়। বন্দী জীবনেও তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নেন নি। এই সময়ে তিনি অসি ছেড়ে মসী ধরেন, লেখেন তাঁর আত্মজীবনী, যা প্রকাশিত হ'য়েছিল ১৮২৩ সালে। লেখক হিসাবে নেপোলিয়ান নিশ্চয় বড় ছিলেন না, এবং এ সম্পর্কে তিনি সচেতনও ছিলেন। তাঁর অনেক মন্তব্যই গ্রহণযোগ্য নয়, এমন কি এ. জে. পি টেলরের ভাষায় "ভুলে ভর্তি" (full of lies)। তবু নেপোলিয়ানের নিজের কথার ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর নামের একটা যাদু ছিল, ছিল তাঁর ব্যক্তিগত Charisma বা সম্মোহনী ভাবমূর্তি। মৃত্যু হলেও তাঁর সর্বাত্মক ছায়া ফ্রান্স তথা ইউরোপ থেকে অপসৃত হয় নি।-মৃত নেপোলিয়ানও যে জীবিত নেপোলিয়ানের থেকে কোন অংশে কম শক্তিশালী বা প্রভাবশালী নয়,



তা প্রমাণিত হ'য়েছিল। তাঁর আত্মজীবনী সৃষ্টি করেছিল এক মোহময় কাল্পনিক পরিমণ্ডল। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর ফ্রান্সের মানুষ যখন দিশাহারা, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র কোন কিছুই যখন গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি, তখন নেপোলিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ান ফ্রান্সের মানুষের মন বুঝে এবং তাঁর পিতৃব্যের নামের মোহময়ী ভাবমূর্তিকে অবলম্বন করে দ্বিতীয় সাম্রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। নেপোলিয়ান প্রমাণ করেছিলেন তিনি মরেও মরেন নি। ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হলেও শেষ জয় হ'য়েছিল তাঁরই। মারখাম এর ভাষা—"Napoleon has his posthumous victory in the creation of the legend."[২২] কিন্তু কেন ও কিভাবে তাঁর আত্মজীবনী ফ্রান্সের মানুষের মন জয় করেছিল? কি ছিল তাঁর আত্মজীবনীর দুর্দমনীয় আকর্ষণ? কেন তা নেপোলিয়ানকে এক কল্প জগতের মানুষে পরিণত করেছিল? এ সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তাঁর জীবন ইতিহাসের মূল কথাই হলো অসম্ভবকে সম্ভব করা। জন্ম নয়, কর্ম ও প্রতিভা দিয়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন অসম্ভব কথাটি থাকে মূর্খের অভিধানে। তাই বিপদের দিনে, সমস্যার সময়ে, ফ্রান্সের মানুষ তাঁর স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরে পরিত্রাণের পথ খুঁজেছিল। ওয়াটারলুর যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয়ও তাঁর জনপ্রিয়তা ম্লান করেন নি। তিনি ছিলেন জয় পরাজয়ের ঊর্ধে। এ. জে. পি. টেলরের সুচিন্তিত অভিমত হলো— "There was no essential difference between Napoleon in victory and in defeat: he always asked the impossible and sometimes it was granted him. This is the real basis of the Napoleonic legend." মৃত্যুর পরও নেপোলিয়ান বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান নি; বরং ঊনিশ শতকের ইউরোপে তাঁর ছায়া দীর্ঘতর হয়েছিল। তিনি পরিণত হ'য়েছিলেন কিংবদন্তীর নায়কে। আজও তাঁকে ঘিরে ঐতিহাসিক ও সাধারণ মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই।

## সূত্র নির্দেশ


১. Thomson David— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭০ ২. Markham—পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১২
৩. Fisher H.A.L— History of Europe— পৃঃ ৮৬১
৪. Rude— The Revolutionary Europe— পৃঃ ২৬৪
৫. ঐ— পৃঃ ২৬৫ ৬. ঐ— পৃঃ ২৬৮
৭. Thomson David— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭১
৮. Markham— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২১ ৯. Rude— পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৬
১০. Grant and Temperley— Europe in 19th and 20th centuries, পৃঃ ১১৪
১১. ঐ— পৃঃ ১১৪ ১২. Cobban— পূর্বোক্ত, Vol- 2, পৃঃ ৫৭
১৩. Grant and Temperley— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬
১৪. Markhan পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১০ ১৫. Rude— পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭৬
১৬. Markhan— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩০
১৭. Thomson David— পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৩
১৮. Morse Spephens— Revolutionary Europe, Holsbawn— The Age of Revolution পৃঃ ১১২
১৯. Grant and Temperly— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২
২০. Cobban— পূর্বোক্ত, Vol-2 পৃঃ ৫৯
২১. Taylor, A.J.P.—Europe: Grandeur and Decline, পৃঃ ১১
২২. Markham— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮
২৩. Taylor, A.J.P— পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫


Scanned with CamScanner